হাজী এ. কে. খান কলেজ

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

পত্রিকা

সীবনী

বার্ষিক সংকলন ২০১৯

।। শ্রদ্ধাঞ্জলী ।।

করোনা মহামারিতে যে সমস্ত মহান গুণী জনেরা
প্রয়াত হয়েছেন,হাজী এ. কে. খান কলেজের শিক্ষক ও
শিক্ষাকর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁদের
সশ্রদ্ধ প্রনাম জানাই।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠন

হাজী এ.কে. খান কলেজ

সীবনী

সাহিত্য পত্রিকা

হাজী এ.কে. খান কলেজ

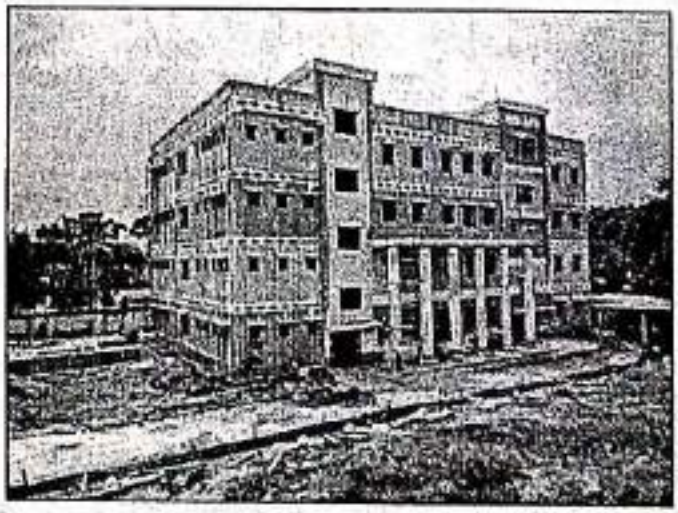

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সীবনী

সাহিত্য পত্রিকা
হাজী এ.কে. খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক
পুলকেশ মণ্ডল ও বিদিশা মুন্সী
সহকারী অধ্যাপক
হাজী এ.কে. খান কলেজ

প্রকাশক
গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ
হাজী এ.কে. খান কলেজ

প্রকাশকাল
৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

বর্ণবিন্যাস
সুমন (৭৮৭২০৫১৭০২)
স্বর্ণময়ী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

মুদ্রণ
ওম প্রিন্টার্স
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৯৪৩৪২৫৫২১৫

সূচীপত্র

■ অধ্যক্ষের কলমে – – পৃ: ৩
■ সম্পাদকদ্বয়ের কিছু কথা – পৃ: ৬
■ কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী – পৃ: ৮
■ কবিতা :
বৃহন্নলা – সাইবা সুলতানা – পৃ.১১ ❖ আমি নারী – রৌমি মণ্ডল – পৃ.১২ ❖ বৃষ্টি মোদের আশা – নিকিতা মণ্ডল – পৃ. ১২ ❖ প্রভাত ক্ষণে – তালপাতার সেপাই – পৃ.১২ ❖ করোনা ভাইরাস – মোঃ নাইস ইসলাম – পৃ.১৩ ❖ ভাষা – আলিউল আজম মালিথ্যা (রুবেল) – পৃ.১৩ ❖ তুমি কখনোই আমার ছিলে না – তনুশ্রী প্রামাণিক – পৃ.১৪ ❖ ক্যালেন্ডার – রশিদা খাতুন – পৃ. ১৫ ❖ স্বপ্নের খাতা – মৃন্ময় প্রামাণিক – পৃ.১৫ ❖ দুষ্টু – সীমা খাতুন – পৃ.১৫ ❖ অপেক্ষমান – আব্দুর রাজ্জাক – পৃ.১৬ ❖ যদি আসে জন্ম আবার – জেসমিন সুলতানা – পৃ.১৬ ❖ জ্বলন্ত মোমবাতি – উম্মে সালমা – পৃ.১৭ ❖ সান্ত্বনা – হজরত আলি সেখ – পৃ.১৮ ❖ মা – সাফাইল হোসেন সেখ – পৃ.১৮ ❖ বাঙালির মেয়ে – কবিতা মণ্ডল – পৃ.১৯ ❖ ভোরের বাতাসের ছন্দ – সাগর দত্ত – পৃ.১৯ ❖ সাধনার সার্থকতা – অতীন ঘোষ (হিসাবরক্ষক) – পৃ.২০ ❖ পৃথিবী আজ বড়ো কষ্টে – সাব্বির মণ্ডল – পৃ.২০ ❖ স্মৃতি – ইতিকা ঘোষ – পৃ.২১ ❖ অন্তিম সমাচার – রিমা ঘোষ – পৃ.২১ ❖ উন্নত ভারতবর্ষ – পম্পা মণ্ডল – পৃ. ২২
■ অনুগল্প :
সুখের জীবন – সীমা খাতুন – পৃ. ২৩ ❖ জনম দৌড় – দীপক বিশ্বাস – পৃ.২৪ অতিমহামারি – পম্পা মণ্ডল – পৃ. ২৫ ❖ চশমা – নীহারুল ইসলাম – পৃ.২৬ কুরবানি – মহম্মদ আলামিন – পৃ. ২৭
■ ছোটোগল্প :
শেষ সম্বল – সাইবা সুলতানা – পৃ.২৮ ❖ নতুন সকালের সন্ধানে–পূজা দত্ত – পৃ.৩১ ❖ অবাধ্যতার শেষ পরিণতি – রুমানা খাতুন – পৃ.৩২ ❖ প্রেমের স্মৃতি – সাকিরুল মণ্ডল – পৃ.৩৪ ❖ একজন আদর্শ শিক্ষক – সাবনাম বানু – পৃ.৩৫ ❖ কালরাত্রি – সাবনাজ পারভিন – পৃ.৩৭
■ প্রবন্ধ :
কিছু কথা, স্বপ্ন, স্মৃতিতে হাজী এ.কে. খান কলেজ – হাতেমুল ইসলাম – পৃ.৪৩ ❖ কোভিড আবহে বিষময় আন্তর্জালিক জীবনধারা – পাভেল আমান – পৃ. ৪৫ ❖ যতদূর মনে পড়ে – প্রণয় কুমার সাহা – পৃ. ৪৭ ❖ বাউল জীবন ও সঙ্গীতে সম্প্রীতির সুর – ড. পুলকেশ মণ্ডল – পৃ. ৫০ ❖ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি – ইনজামামউল হক – পৃ. ৫৪ ❖ SHE — Shahina Mumtaz – পৃ. ৫৬ ❖ Value Education and Peace Education in the 21st Century – Dr. Nanigopal Malo, Assistant Professor – পৃ. ৫৭ ❖ নজরুলের কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শের প্রতিফলন – শ্রাবন্তী সরকার – পৃ. ৬৩
■ নাটক : পাট-রানী – সামিম আকতার মোল্লা ৬৫

অধ্যক্ষের কলমে –

"অন্তর মাঝে শুধু তুমি এক একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।"

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সত্তা সমগ্র বিশ্বে নানা বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ করে বিরাজমান তাই আবার অন্তরলোকে শাশ্বতরূপে একাকীত্বে উদ্ভাসিত। বিশ্বের মানুষ আজ গৃহমুখী। করোনাকালীন এই মহামারীর মধ্যে অবশেষে আমাদের কলেজের পত্রিকা সীবনী প্রকাশ পেতে চলেছে। একটা এমন একটি বছর যা মানব জীবন প্রবাহে কাঁটা স্বরূপ। এই কাঁটার পথ পেরিয়ে প্রাণ প্রবাহ এগিয়ে চলেছে জাগতিক নিয়মে। আসলে পৃথিবীর গভীরতম অসুখ এখন। জীবনানন্দের কথায় –

"পৃথিবীর গভীরতম অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে।"

পৃথিবীর যতই গভীর অসুখ হোক, তা একদিন সেরে উঠবে, মানুষ তা জয় করবে, তবে তাকে পৃথিবীর সবুজে ঘেরা প্রকৃতির উপরই নির্ভর করতে হবে। জীবন প্রবাহের সাথে সাথে মনের বাসনাও প্রসারিত ও প্রচারিত হতে থাকবে। জীব ও মানুষের মধ্যে যেমন লোভ, ত্রাস ও হিংস্রতা রয়েছে, তেমনি বিপুল শান্তির সম্ভাবনা রয়েছে প্রকৃতি ও পশুপাখির মধ্যে। তাই কবি বলে ওঠেন :

"সুচেতনা, তুমি এক দূরতম দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।"

সেই সময়ে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ দাশ যে জীবনকে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে গ্রহণ এবং প্রকাশ করেছেন তা আমরা আজকের দিনে উপলব্ধি করতে পারছি। অর্থাৎ যদি প্রকৃতি বাঁচে তাহলে আমরা বাঁচব। প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেই আমরা এগিয়ে চলব। আমাদের এই এগিয়ে চলা কোনোদিন বাধা মানব না। তাই মহামারী দুর্ভিক্ষ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ কোনোদিন স্থায়ী বাধা হয়ে থাকেনি। আজও মারণরোগ বাধা হয়ে থাকতে পারেনি বলেই সহকারী অধ্যাপক পুলকেশ মণ্ডল ও বিদিশা মুন্সীর সম্পাদনায় 'সীবনী' প্রকাশিত হল।

সীবনী পত্রিকার প্রকাশে মিশে আছে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্যম আবেগ ও বিশুদ্ধতা। দিনানু দৈনিকের গ্লানির ধূসরতা আনে অবসাদ ও হতাশা। আর হতাশা থেকেই সৃষ্টি হয় আশা। নতুন লেখা বাঁচার মোহিনী আমন্ত্রণ জানায়। আর তখনই সকল বাধা ধন্য করে ফুটে ওঠে লাল গোলাপ। জীবনের ব্যস্তিই উঠে আসে লেখার কলমে।

নতুন ভাবনার আনন্দ আমাদের জীবনকে করে তোলে সুন্দর। মহত্ত্ব আর বিনয় হল উপলব্ধির নরম নিবিড় পথ। অনেক লেখা নিজস্বতায় ও প্রকাশ বৈচিত্রে শক্তিশালী। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয় লেখার চর্চাটা নিয়মিত ধরে রাখবে।

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়
তোমারি হোক জয়।"

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলেজ পত্রিকার প্রকাশ যে কোনো কলেজের পক্ষে একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু পত্রিকার আসল প্রাণশক্তি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী – তারাই আপন আপন অন্তরঙ্গের ভাবটিকে রঙে রেখায় রূপ দিয়ে সাজিয়ে তোলে পত্রিকার অন্দরমহল। কলেজ জীবনে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে পার হয়। প্রথম তারুণ্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের পথই প্রস্তুত করে না, তাদের মানস পরিকাঠামোকেও গড়ে দেয়। কলেজ পত্রিকা তাদের অস্ফুট আবেগ সঙ্কুচিত শিল্পীমনকে জায়গা করে দেয়।

কর্মসূত্রে অধ্যাপনার কাজে দীর্ঘদিন এই জেলায় থাকার তাগিদে এখানকার মানুষদের প্রতি একটা মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। অবশেষে অধ্যক্ষ হিসাবে এই কলেজে যোগদানের পর থেকেই কলেজের উন্নয়নের জন্য এলাকার সুশীল সমাজের মানুষের আবেগ ও উচ্ছ্বাস আমাকে চঞ্চল করে তোলে। শুধু স্বপ্ন দেখানো নয়, এলাকার মানুষের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের মর্যাদা দিয়ে কলেজের পরিকাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। সেগুলি :

১. হাজী সাহেবের ইচ্ছা অনুযায়ী এলাকার সংখ্যালঘু মেয়েদের বেশি করে কলেজমুখী করা।
২. এলাকার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচলন এবং হস্তশিল্পের উপর জোর দেওয়া।
৩. কলেজ প্রাঙ্গণে এলাকার মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবির গড়ে তোলা।
৪. সরকার প্রদত্ত সমস্তরকম স্কলারশিপ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৫. ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চার উপর জোর দেওয়া।
৬. পরিবেশ সচেতনতার উপর জোর দেওয়ার জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে গড়ে তোলা হবে দৃষ্টিনন্দন উদ্যান।
৭. দূর-দূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসের পুনর্গঠন।
৮. ছাত্র-ছাত্রীদের সুলভ মূল্যের খাদ্য ও পানীয়জলের জন্য ক্যান্টিন ব্যবস্থা।
৯. N.S.S. এবং N.C.C. মাধ্যমে পরিবেশ ও সামাজিক সচেতনতার উপর জোর দিয়ে গড়ে তোলা হবে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিবির।
১০. এখান থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন চাকুরির প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করা।

এতকিছু পরিকল্পনা সবটাই সকলের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আমার কর্মযজ্ঞ থেমে থাকবে না। পত্রিকায় নতুন প্রজন্মের এই লেখকরা কলেজের স্বাস্থ্যকর আলো-জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠবে। কলেজের কারিগরি প্রকল্পকে পরমোৎসাহে সযত্নে বছরের পর বছর ধরে রূপায়িত করার সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকেন, সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং প্রশাসনিক স্তরের ব্যক্তিবর্গ -- সকলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে কাউকে ছোটো করতে চাই না, তবে অবশ্যই বিশেষভাবে আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই পুলকেশ মণ্ডলকে, যিনি গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনার এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। হাজী এ.কে. খান কলেজ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম মুখপাত্র এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি সম্পর্কে মূল্যবান প্রতিক্রিয়াগুলি পত্রিকার আগামী সমৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম। পত্রিকার সফলতা কামনা করি।

তারিখ : ০২/০৯/২০২১

ড. গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ
হাজী এ.কে. খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকদ্বয়ের কিছু কথা –

হাজী এ. কে. খান কলেজ পত্রিকা 'সীবনী' দীর্ঘকাল পর আবার প্রকাশের আলো দেখতে চলেছে।

"...সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবন সংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।"

– গোপাল হালদার

হাজী এ. কে. খান কলেজ পত্রিকা 'সীবনী' অবশ্যই হয়ে উঠেছে কলেজের এক গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। স্থবিরতা নয়, বহমানতাই হল জীবনের লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই শক্তির স্ফুলিঙ্গ ভস্মাবৃত অবস্থায় থাকে। প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের জোরেই ভস্মরাশির অপসারণ ও অন্তর্শায়ী শক্তির প্রকাশ ঘটে। এবছর পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্ মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা সেভাবে বেশি সংখ্যক লেখা জমা দিতে পারেনি। আশা রাখি, আগামীতে এমনটি হবে না। ছাত্রছাত্রীদের প্রকাশোন্মুখ সৃজনীশক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণে এসে যায় –

"ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ববিদ্যা-শিক্ষালয়ে
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে।"

জীবন কতগুলো বছর, মাস, দিনের সমাহারমাত্র নয়; জীবন মহত্তর এবং কর্মই জীবন। কর্মের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। হাজী এ.কে. খান কলেজেও সারা বছর জুড়ে নানা কর্মধারার স্রোত বহমান। কলেজের আই.কিউ.সি. সেল একটি জাতীয় স্তরের এবং বাংলা বিভাগ ও আই কিউ এ সির যৌথ উদ্যোগে দু-দুটি আন্তর্জাতিক স্তরের আন্তর্জালিক আলোচনাচক্র হয়ে গেছে। প্রাণের লক্ষণ উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া কিন্তু মানুষের এছাড়াও বড়ো বৈশিষ্ট, নিজেকে প্রকাশ ও বিকাশ করা। কিছু মানুষ প্রকাশের পাশাপাশি আপন সত্ত্বাকে নিরন্তর বিকাশ করে চলেছে। এই বিকাশশীল মানুষের পরিশ্রমে পৃথিবী প্রতিনিয়ত নানাভাবে ফলবতী হচ্ছে। আদিম পশু সভ্যতা থেকে আজকের আধুনিক সভ্যতা এই মানুষেরই পরিচর্যার দান। আমরা দেবতার পরিবর্তে তাদেরকেই পূজা করি। পত্রিকার পক্ষ থেকে সেই সৃজনশীল চেতনাকে শতকোটি প্রণাম। এর সঙ্গে আগাম শুভেচ্ছা জানাই সেই সকল রসজ্ঞ পাঠক সমাজকে যারা পত্রিকাটি পাঠ করে অন্যদের সঙ্গে নিজেকেও সমৃদ্ধ করে নেবেন।

'সীবনী' দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত ছিল কিন্তু এবার কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রকাশ পেতে চলেছে। লেখার শিল্পনৈপুণ্যতার বিচারের দায়িত্ব আপনাদের। শিউলি ফুলের গোটা অনেককে ঝরিয়ে দেয়। নবীন এসে নতুন মুকুলে বাসা বাঁধে। আমরাও সেই

নবীনদেরই প্রতিনিধি। ভুল তাই অবশ্যম্ভাবী। পত্রিকা প্রকাশে, বিকাশে, বয়নে, অলঙ্করণে কিছু ভুল যদি থাকে তা সম্পূর্ণরূপে আমাদের। হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত স্বপ্ন কেবলই বিকশিত হতে চায়। তাকে প্রশ্রয় দিতেই এই দায়িত্ব আপন করে নেওয়া।

সর্বপ্রথম পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় হাতেমুল ইসলাম মহাশয়ের অকৃপণ সহযোগিতা ও প্রেরণা প্রদানের জন্য তাকে অকুণ্ঠ চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেইসঙ্গে কলেজ তরীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাণ্ডারী নবাগত অধ্যক্ষ মাননীয় গৌতম কুমার ঘোষ মহাশয়কে স্বাগত জানাই, সেইসঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা দান ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা থাকার কারণে লেখা খুব একটা বেশি না হওয়ায় হতাশ হয়েছিলাম। মুনমুন ম্যাডাম সাবলীলভাবে বলেছিলেন, একদম চিন্তা করবেন না, ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ম্যাডামের কথায় ঠিক, অবশেষে পত্রিকা প্রকাশ পেতে চলেছে। পত্রিকা কমিটির বাইরেও যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তারা হলেন শ্রী অতীন ঘোষ, যার আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই অল্পসময়ে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হত না। আর দুজন হলেন ইনজামামুল হক ও আব্দুর রাজ্জাক, যাঁরা প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নিয়েছেন – কটা লেখা স্যার পেলেন? আমাদেরকে কোনোভাবে সাহায্য করতে হবে কিনা ইত্যাদি। এছাড়া বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের।

অবশেষে এই জগতের মহৎ-যজ্ঞে যাঁরা আপন মনের মাধুরী দান করে অসময়ে ঝরে গেছেন তাদের প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। পত্রিকার এই সংখ্যা যাঁদের লেখায় উজ্জ্বল হয়েছে এবং যাঁদের লেখা বিভিন্ন কারণে পাঠকের সামনে আনতে পারলাম না, তাদের সকলকেই সম-শ্রদ্ধা জানাই।

আহ্নিকগতি এবং বার্ষিকগতির প্রেরণায় পৃথিবী যেমন তাঁর অনন্ত সূর্যপরিক্রমার পথে এগিয়ে চলে, তার সঙ্গে সুর ছন্দ লয় মিলিয়ে হাজী এ. কে. খান কলেজ পত্রিকা 'সীবনী'ও এগিয়ে চলবে কালের অনন্ত যাত্রাপথে। আশা করি আগামীদিনে পত্রিকাটি ফুলে-ফলে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

বিনীত –

পুলকেশ মণ্ডল ও বিদিশা মুন্সী

সহকারী অধ্যাপক

-: কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী :-

অধ্যক্ষ	:	ড. গৌতম কুমার ঘোষ	এম.এ., বি.এড., পি.এইচ.ডি.।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	:	ড. পুলকেশ মণ্ডল	এম.এ., বি.এড., নেট্(জে.আর.এফ.), পি.এইচ, ডি.
		ড. ননীগোপাল মালো	এম.এ., পি.এইচ.ডি.
		ইনজামাম উল হক	এম.এ., বি.এড.
		আব্দুর রাজ্জাক	এম.এ., বি.এড.
ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	:	সামিম আকতার মোল্লা	এম.এ., এম.ফিল.
		বিদিশা মুন্সী	এম.এ.
		বাহাদুর বিশ্বাস	এম.এ.
দর্শন বিভাগ	:	ড. মুনমুন দত্ত	এম.এ., এম.ফিল., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
		ইমানুয়েল হাঁসদা	এম.এ., এম.ফিল., সেট্
		ম: সেলিম হক	এম.এ., নেট্, সেট্
		আসমিন সেখ	এম.এ., বি.এড.
ইতিহাস বিভাগ	:	ড. পিয়ালী দাঁ	এম.এ., পি.এইচ.ডি.
		ড. চন্দ্রানী পাল	এম.এ., (এ.আইচ.এইচ.সি.), (এম.ইউ.এস.ই.), পি.এইচ.ডি.
		কিশোর সরকার	এম.এ., বি.এড., নেট্, সেট্
		অনিকেত সরকার	এম.এ., বি.এড.
		বাদশা খাঁন	এম.এ., বি.এড.
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ	:	ড. কৃষ্ণেন্দু মুন্সী	এম.এ. (এডুকেশন), ইংরেজি, বি.এড., পি.এইচ.ডি.
		শ্রাবন্তী সরকার	এম.এ., (এডুকেশন), (ইতিহাস), বি.এড., এম.ফিল.
		ফারুক সেখ	এম.এ., বি.এড.
		মো: ইসমাইল হক	এম.এ., বি.এড.

		মিঠুন সেখ	এম.এ., বি.এড.
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	:	সাফাইল হোসেন শেখ	এম.এ., বি.এড.
ভূগোল বিভাগ	:	প্রত্যুষ কুমার ঘোষ	এম.এস.সি.
		পরিমল কর্মকার	এম.এস.সি.
		বুবাই ঘোষ	এম.এস.সি.
শারীরশিক্ষা বিভাগ	:	সঞ্জিত কুমার রায়	এম.এ., এম.পি.এড.
		মো: ওসমান গনি	এম.এ., এম.পি.এড.
পরিবেশবিদ্যা বিভাগ	:	মহামায়া ঘোষ	এম.এ., বি.এড.
সমরবিদ্যা বিভাগ:			
গণিত বিভাগ	:		
সংস্কৃত বিভাগ	:	দেবদ্যুতি চক্রবর্তী	এম.এ., বি.এড.
আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	:	মো: রেজাউল করিম খান	এম.এ.
		মো: নবাবজানি	এম.এ., বি.এড.
		আব্দুর রহমান	এম.এ., বি.এড.
গ্রন্থাগারিক	:	কিসমত শেখ	অস্থায়ীকর্মী
		রফিকুল খান	অস্থায়ীকর্মী
অফিস বিভাগ	:	অতীন ঘোষ	হিসাব রক্ষক
		প্রলয় কুমার সাহা	কোষাধ্যক্ষ
		জামিলা খাতুন	করণিক
		হাসানুল ইসলাম	পিওন
		সুকুমার বিশ্বাস	পিওন
		আমিনুর জামান	দাররক্ষী
		রঞ্জিত কুমার দাশ	অংশকালীন ঝাড়ুদার

এ পর্যন্ত আমরা আমাদের কলেজের পূর্ণ সময়ের অধ্যক্ষরূপে পেয়েছি –

ক্রমিক নং	নাম	কার্য্যকাল
১.	ড. গৌতম কুমার ঘোষ	০৭.০৭.২০২১ –

"বহুর মধ্যে ঐক্য, উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন – ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে আমরা আমাদের বিস্তারেই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রিস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না, এইখানে তাহার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। এই সামঞ্জস্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই বিদেশের হউক তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।....(তাই) ঐক্য সাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ।"

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বদেশী সমাজ)

বৃহন্নলা

সাইবা সুলতানা
বাংলা অনার্স, ষষ্ঠ সেমিস্টার

কেউ ডাকে বৃহন্নলা, কেউ নপুংসক, কেউ আবার হিজড়া
তাদের কোনো মান নেই, নেই কোনো জাত, নেই কোনো সমাজ সংসার ভালোবাসা
সমাজ তাচ্ছিল্যস্বরূপ তাদের পরিয়েছে অস্বাভাবিকতার মুকুট
জীবন জুড়ে সাজিয়ে দিয়েছে হাহাকার আর শূন্যতা,
লাঞ্ছনা আর কটূক্তিতে তাদের জীবনকে করেছে দুর্বিসহ
অবহেলা-অনাচারে তাদের করেছে পথের ধুলা –

এত গঞ্জনা, এত অপমান, এত অবজ্ঞা কি তাদের প্রাপ্য?
তারাও তো রক্তমাংসে গড়া মানুষ
তাদের সৃষ্টিও তো ক্ষুদ্র রক্তপিণ্ড থেকেই
কেন সেই সদ্য ফোঁটা ফুলকে মাতৃক্রোড় থেকে নিংড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছ কর্দমাক্ত
ঠিকানা ছিন্ন করে তাদের করেছ নিরক্ষর-অনাথ
সে তো সমাজের কলঙ্ক নয়, তারা তো বিধাতার অপূর্ব
মহৎ সত্ত্বা – অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী – এক অদ্বিতীয়
কেন তোমরা তাদের বাঁকা চোখে দেখো? কেন এত ঘৃণা
যদি ঘৃণা করতেই হয় তবে সমাজের মুখোশধারী মানুষদের করো
মানবতার নামে করছে খেলা – সেইসব নেতাদের
মিথ্যা প্রতিশ্রুতির নামে দেশকে করছে বিক্রি
হিজড়াদের নয় –
অনেক বেশি সজ্ঞান – নীরব, নিষ্ক্রিয়, স্বার্থপর
অনেক বেশি সাহসী – দরদী।

আমি নারী

রৌমি মণ্ডল
বাংলা অনার্স, ষষ্ঠ সেমিস্টার

তোমার উপন্যাসের নায়িকা বানাবে?
আমি অন্য লেখকের উপন্যাসে রূপান্তরিত হতে চাই না,
আমাকে আমার রূপে সাজিও।
আমি পারি না। ঘন কালো চুল দিয়ে
কারোর হৃদয়ে আন্দোলন তুলতে।
তাই আমাকে তোমার উপন্যাসের নায়িকা বানিয়ো।
কালো হতে পারি, অসুন্দর না।
লেখার মতো কিছু পাবে না,
দু-ফোঁটা চোখের জল ছাড়া।
বলছি না আমাকে ঈশ্বরীর রূপে সাজাতে।
আমাকে নারীর রূপে সাজিয়েই না হয় কিছু লিখো।
আমি নারী, নারী সাজিয়েই নায়িকা বানিয়ো।
আমি অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী না
আমি নারী, নারী, নারী।

বৃষ্টি মোদের আশা

নিকিতা মণ্ডল
ভূগোল অনার্স

বৃষ্টি তুমি সবার আশা,
বৃষ্টি, তুমি সবার ভালোবাসা।
তোমার আশায় আছে অনেকে বসে
তুমি আছো কারে ভালোবেসে?
তাদের দেখে দুঃখ হয় বড়ো,
তাই তুমি তাদের হয়ে
একটি বার দাও দেখা,
বৃষ্টি তুমি সবার আশা,
বৃষ্টি, তুমি সবার ভালোবাসা।

প্রভাত ক্ষণে

তালপাতার সেপাই

প্রভাত ক্ষণে পূর্ব গগণে –
হীরক থালা গোলক বর্ণে, উকারিত রবি।
সর্ষে কেতে পুষ্প নৃত্য-দোদুলতে
ভ্রমরের দল পুলক কোলাহল,
মধু শোষণ শোপান পুষ্পে নৃত্য-নৃত্যে।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর
রৌদ্র পড়ে দুপুর,
কৃষক এর অন্নাশনে গত প্রহর –
সর্বাঙ্গ হয় বেভুর।
মেঠো ঘাটে চৌপ্রহর খেটে
গৃহে গমন চরণ হেঁটে,
গৃহে মুদ্রা বিনা –
গৃহিনী বিচ্ছে ঘৃণা,
পিঠে ঘাতে কাঁটা পিটে।
আহারে। শ্রমিক-এর দল –
বল তোরে এ-হেন কি হাল –
দু-দণ্ড খেটে
দু-মুঠো অন্ন পেটে
নাটি জোটে।
চৈত্র রৌদ্র কিরণে ত্বক দগ্ধ –
কৃষক-এর অনাহার অনাচার, কান্নার শব্দ,
ভেসে আসছে ঐ
কান্নার হই, চই
মন মন আঁকি সেই ছবি –

করোনা ভাইরাস

মোঃ নাইস ইসলাম

সময়টা ছিল মার্চ মাসের ২০২০,
নেমে আসলো পুরো দেশ জুড়ে এক কালোচ্ছায় ভাইরাস,
চিন সৃষ্ট এই ভাইরাসের নাম নাকি করোনা,
না জানি এই ভাইরাস কত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিলো,
চারিদিকে শুধু মৃত মানুষের ছড়াছড়ি।

এ ভাইরাস না দেখে ধর্ম, না দেখে রাজনীতি,
এতো আর আমরা মানুষেরা নই,
যে সব কিছুতেই বিভেদ করি।

এ ভাইরাস নাকি আবার একে অপরের সঙ্গে
মেলামেলা করার ফলে আরো বেশি ছড়াই,
এই ভাইরাস থেকে দেশ বাঁচানোর, আছে নাকি
একটাই উপায়, লকডাউন;
কারো সঙ্গে না মেলামেশা করে,
থাকতে হবে নিজের ঘরে,
বাইরে গেলে পরতে হবে মাস্ক,
ব্যবহার করতে হবে স্যানিটাইজার,
তা হলেই নাকি পালন হবে লকডাউন।

লকডাউন মানতে বন্ধ স্কুল, বন্ধ কলেজ
তাই তো আলমারির বইগুলোর উপর
ধুলোয় ভরা আস্তরণ,
তবে করোনা আমাদের শেখালো অনেক কিছু।

ভাষা

আলিউল আজম মালিথ্যা (রুবেল)

"ভাষা আমার কাছে রামধনুর মতো"

কখনো নীল কখনো বা কালো।

ভাষা কখনো প্রেম নিবেদন করে,
কখনো বা প্রত্যাখান করে।

"ভাষা আমার কাছে রামধনুর মতো"

ভাষা কখনো সুখ দেয়,
কখনো কষ্ট দেয়।
ভাষায় অনুপ্রেরণা;
ভাষায় সম্পর্ক।
ভাষা কখনো মিষ্টি,
আবার কখনো বা তেতো।

"ভাষা আমার কাছে রামধনুর মতো"

ভাষা চাইলে তুমি তুই হয়, কিন্তু তুই কখনো তুমি হয় না।
ভাষা কখনো গরিবের;
কখনো ধনীদের।

ভাষার মধ্যেই সর্বরং

তাই,
"ভাষা আমার কাছে রামধনুর মতো"।

কবিতা

তুমি কখনোই আমার ছিলে না

তনুশ্রী প্রামাণিক
বাংলা অনার্স, ষষ্ঠ সেমিস্টার

আমি জানি তুমি তো কখনোই আমার ছিলে না,
আমার হৃদয়ে তুমি ফুটিয়েছিলে প্রথম প্রেমের পদ্ম;
তখন কি সত্যি আমার ছিলে?
ছিলে না, তুমি তখনও আমার ছিলে না।

যখন প্রেমকেই সর্বেসর্বা জেনে কাটাচ্ছিলাম উন্মত্ত যৌবন,
যখন তোমায় আমায় নিদারুণ সুখে কাটাচ্ছিলাম অপেক্ষার দীর্ঘ রজনী,
যখন গভীর রাতে ফোনালাপে তুমি শোনাচ্ছিলে আমায় সুদীর্ঘ কবিতা,
ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকা সেই জ্যোৎস্না মাখানো রাতেও তুমি আমার ছিলে না।

যখন তোমার বাহুবন্ধনে এক ভীতু আমি সাহসী হতাম ধীরে ধীরে,
যখন আমার চুলের খোঁপায় গুঁজে দিতাম গুচ্ছ গুচ্ছ প্রেম,
তোমার থেকে দূরত্বের করুণ অনলে যখন দাহ হত আমার অতৃপ্ত হৃদয়,
আমি নির্বোধের মতো ভাবতাম তুমি আমার!
অথচ, আমি জানি তখনও তুমি আমার ছিলে না।

যখন তোমার দেখানো হাজারো স্বপ্নের প্রেমকাতরে মত্ত আমি,
যখন তোমার আঁধার ভাঙা চোখের জল মুছে দেওয়ার কথা দিই,
যখন তোমার বাহুবন্ধনে আমি নিজেকে উন্মুক্ত করি,
সেই কামনার উদ্বেলিত আগুনেও
তুমি আমার ছিলে না।

তোমার সেসব নিদারুণ ঘাতক প্রেমের শপথ করে বলছি,
আমি কেবলই তোমার ছিলাম।
তুমি কখনোই আমার ছিলে না।

ক্যালেন্ডার

রশিদা খাতুন

ওহে ক্যালেন্ডার ওহে
তুমি কি জানো
তোমার মধ্যে কতগুলো মাস থাকে লুকায়ে।
আচ্ছা তুমি কি থাক সেই দিনের অপেক্ষায়
যেই দিনের অপেক্ষায় আমরা থাকি বসে।
আচ্ছা শোনো তবে তোমায় বলি
দিনটি হল সবার কাছে দামি।
নতুন বছরের প্রথম দিন
সবার কাছে হয় রঙিন।
আচ্ছা তুমি কি থাক সেই দিন খুশি
যতটা করি আমরা আনন্দ।
আচ্ছা তুমি তো মাত্র একবছরের জন্য
তারপর কি তোমার চলে যেতে হয় না কোনো কষ্ট।
যেইদিনগুলো দেখে আমরা কাটাতাম সারাবছর
আজ সেইদিনগুলো নাকি দেখতে হবে অন্য ক্যালেন্ডার থেকে।
এই বলেই করছি শেষ
এটাই বিধাতার নীতি
ভালো থেকো সুখে থেকো এই কামনাই করি।

স্বপ্নের খাতা

মৃন্ময় প্রামাণিক
দ্বিতীয় সেমিস্টার
হাজী এ.কে. খান কলেজ

কাগজ আছে স্বপ্ন আছে
কলম আছে হাতে।
লিখবই আমি লিখব কিছু
ভেবেছি আজ রাতে।
ম্যাগাজিনে হবে ছাপা
থাকবে আমার নাম,
কি ভালো লাগবে সবার
ভালো কী তার দাম?
কলম ধরে বসে আছি
হয়নি কিছু লেখা,
এতবড় কাগজ নিলাম
সবই যেন ফাঁকা।।

দুষ্টু

সীমা খাতুন

আমি ভাই দুষ্টুমিতে নাই।
আমি তো ভাই সুবোধ বালক সবার ভালো চাই।
এটাতো ভাই মন্দ কথা নয়।
আমি তো ভাই দুষ্টুমিতে নাই।
তবে আমায় লোকে মন্দ কয়।
বলোতো ভাই, তাতে কী বা আসে যায়।

কোন সে ছেলে-বেলায় খেলেছি ধরপাকড়াই
করেছি আম চুরি,
সেই সব কী ভাই এই বেলায় মনেরই
আমি তো ভাই সুবোধ বালক দুষ্টুমিতে নাই।।

অপেক্ষমান

আব্দুর রাজ্জাক
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
হাজী এ.কে. খান কলেজ

একটা হেরে যাওয়া লড়াই লড়ছি।
ঝাউপাতা বেয়ে রক্তমাখা রোদ
তোমার গালে ঢলে পড়ে –
আমার বেয়নেট জুড়ে গোলাপগুচ্ছ
অশুচি যুদ্ধের অভিনয়। আরো
সহস্র বছর পর দুনিয়া যুদ্ধ-দানবের
গোলামতি থেকে রেহাই পাবে যখন –
তোমাকে নিয়ে যাব এক নদীর তীরে;
আঙুরের বাগান চারিদিকে সবুজের
কারসাজি।
অভিসার ক্ষেত্র হবে সেটি
প্রকৃতির নিয়মে একদিন
বসন্ত আসবেই...
তাই;
তুমি থেকো। আমি আসব।

যদি আসে জন্ম আবার

জেসমিন সুলতানা
ইতিহাস অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

যদি আসে জন্ম আবার
দেখব তখন বিশ্বটাকে
নতুনভাবে নতুন করে
বোঝাবো সব শত্রু যারা
আছিস কোথায়, কিরূপ ধরে
মুখোশ সেদিন খুলবোই তোদের
একাই আমি এক এক করে
জানবি না তো কেউ তো তোরা
মারছে কে আজ নতুন যারা
অতীত কথা ভুলবি একশ
ভাববি তোরা শত্রু যারা
নেই কো বেঁচে আজকে তারা।।

কবিতা

জ্বলন্ত মোমবাতি

উম্মে সালমা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অনার্স, (চতুর্থ সেমিস্টার)

একটা জ্বলন্ত মোমবাতি
নিমেষেই কেমন যেন শেষ
তারপর নেমে এল
হঠাৎই
অন্ধকার সেই দেশ
যেখানে লেখা সেই
অজানা গল্পের বই
কাচের গ্লাসের মতো
ভেঙে পড়া মনের টুকরোই বা কই?
খুঁজতে খুঁজতে সেই অন্ধকারটাই
কেমন যেন হারিয়ে গেল
সব শেষ পর্যন্ত পড়েও
কোথায় কী বা ফিরে পেলাম।
গল্পের সেই মেয়েটার শেষটা
সেও জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলো
সব শেষের পরও মেয়েটা
কষ্টটা নিজের মাঝেই রাখল।
প্রথম মুহূর্তে
মেয়েটা সেই হাসিখুশি চেহারা
তার যেন চোখেই জ্বলছে তারারা
তার সেই স্বচ্ছ চরিত্র
চাঁদে দাগ থাকলেও নেই যে তাতে দাগ
সে যেন খুব খুশি
মনে হচ্ছে পেয়ে গেছে সবটুকু
পেয়ে গেছে আসল ভালোবাসার ভাগ।
দূর হয়েছে সকল কষ্ট
হয়েছে সবার চেয়ে যেন
তার জীবনই শ্রেষ্ঠ।
চেয়ে দেখে
অন্ধকার সেই নিঝুম
শেষ মুহূর্তে এসে
ঘরের মাঝে
মেঝেতে পড়ে
কাচের গ্লাসের টুকরো
আর পুরো ঘরে কেমন গন্ধ এক উগ্র
পাশে রয়েছে পড়ে
সাইনাইডের লোগো লাগানো বোতল
একটু দূরেই,
শরীর যেটা হিমের মতো শীতল
আর
হাতে একটা ফোন
যাতে একটা ফটোই দেখায়
হ্যাঁ সেই ছেলেটার
হ্যাঁ সেই ছেলেটার
যে ছিল তার মন ময়
যে এই সবকিছুর শুরু থেকে শেষটা
দাঁড়িয়ে দেখছিল জানলায়।

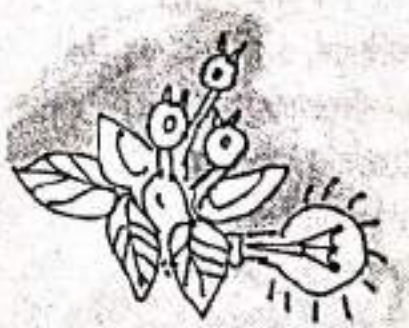

কবিতা

সান্ত্বনা

হজরত আলি সেখ
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, করিমপুর

আজি তিমিরে কি শোনালে বাণী?
আর কতদিন টানিবে ঘানি।
নসিবের ফ্যারে হতবাক আমি।
পারিনি দিতে তোমা কিছু।
জ্বলন্ত হৃদে, সহিছো নীরবে।
আজি এ-কালে
ধবল পালে, চলিছে তরীখানি?
মলয় বহিছে নীড়ে গরমের কালে?
না-তা নয়, তবুও চেপে যাও সবে।
কেমনে চাপা দিবে? জানি না।
সবই সম্ভব তাই না?
সবকিছু আঁচলে রেখো বেঁধে।
যতনে। পারবে?
সে-তো তোমার ব্যাপার।
মনে আসছে না কিছু, এ-হেন ক্ষণে।
শুধু সয়ে যাও, যাও শুধু সয়ে।
কেহ জানিল না, শুনিল না কেহ।
নীরবে নিভৃতে কাঁদে প্রাণ।
কোথা স্থান?
হানে অগ্নিবাণ, চতুর্দিক হতে।
এ-কলির তান
মরা গাঙে ভরা বানের আশায়
এখনও চাহিয়া রবে?
উদিবে রবি আবার?
খোদা কি শান? আলবাৎ
যতই চাহিয়া থাকুক শতেক শয়তান।

মা

সাফাইল হোসেন সেখ
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

বুকের পাঁজর গেছে ভেঙে তোমাকে হারিয়ে মাগো,
তোমাকে হারিয়ে।
ঘুম আসে না দু-চোখে আজ তোমায় মনে করে মাগো,
তোমায় মনে করে।
স্নেহলতার ছায়ার মতো আমার কাছে ছড়িয়ে ছিলে
আজকে তো সব শূন্য লাগে তোমায় মনে পড়লে মাগো,
তোমায় মনে পড়লে।
নিজের জীবন বাজি রেখে রেখেছ যতনে তুমি
আমায় ভালোবেসো মাগো
আমায় ভালোবেসো।
আধপেটা ভাত পাওনি তুমি কোনো এক সময়ে মাগো,
কোনো এক সময়ে।
অনাহারে অনাদরে কেটেছে দিন তোমার সবে
বুঝতে পারিনি তখন বুঝি কষ্ট কাকে বলে মাগো,
কষ্ট কাকে বলে।
আজকে সবে সুখের দিনে বিদায় নিলে চিরতরে
চিরঘুমের দেশে মাগো,
চিরঘুমের দেশে।
একা আছো কোথায় আছো নাও নাতো খোঁজ আগের মতো
মাগো আগের মতো করে।
তোমার স্মৃতি জড়িয়ে বুকে আজও আমি আছি চেয়ে
তোমায় মনে করে মাগো,
তোমায় মনে করে।

বাঙালির মেয়ে

কবিতা মণ্ডল

বাঙালির মেয়ে তোমরা
একটু বুঝে চলো,
যদি কিছু বলার থাকে
ভেবে চিন্তে বলো।
বিংশ শতক পেরিয়ে তোমরা
হয়েছ আধুনিক,
বাঙালির পূর্ব গৌরব এখন
হয়েছে কাল্পনিক।
বাংলা নববর্ষ শুনলে পরে
পাশ কাটিয়ে চলো
হ্যাপি নিউ ইয়ার বলো।
রবীন্দ্র-নজরুল সংগীতকে
দাওনা তোমরা চান্স,
ইংরেজি গানের তালে
তোমরা করো পপ ডান্স।
বাঙালির শাড়ি চুড়িদার
লাগে না তোমাদের স্মার্ট,
তাই এইসব ছেড়ে দিয়ে
পরো জিন্স ও মিনিস্কার্ট।
সাবিত্রী সারদামণি নাম
বইতে পড়েছ
তাদের কথা ভুলে অশালীন নারীদের
আদর্শ করেছ।
মাছ, ডাল, ভাতেতে আর
খাদ্যগুণ নাই;
তাই তোমাদের প্রিয় খাবার
স্যান্ডউইচ, চাওমিন, মোগলাই
হাসি মুখে করো তোমরা
ভালো মানুষের ভান
তোমাদের জালে পা দিলে কেউ
পাবে না পরিত্রাণ।

ভোরের বাতাসের ছন্দ

সাগর দত্ত

ভোরের বাতাস গান গায়, সকাল হয় সূর্য ওঠে। সূর্যের আলোয় আলোকিত পৃথিবী, এক দিনের সূচনা করে। ভোরের বাতাস আবার গান গাইতে শুরু করে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কে যেন ছন্দ তোলে। সূর্যের আলোয় সে গোলাপের মতো ফুটে ওঠে, ভোর হলে সে ট্রেনের মতো ছন্দ তোলে। জানি না সে কে? দেখিনি আমি সেই ছন্দের জাদুকর-কে। সে ভেসে বেড়ায় সাগর থেকে আকাশে, সে বেঁচে থাকবে তার এই দুটি স্বপ্নের নামে, সে ভেসে ওঠে ভোরের বাতাসে। চিত্র তার আজও অমর, যেই দেখে সেই বলে, প্রকৃত দার্শনিক ছিল সে। সে ছিল বনের ছায়া মনের সাথী, নিজেকে ত্যাগ করল পথের ধারে। বেলা চলে যায়, বাতাস এসে বলল, কে যেন মিলিয়ে গেল পথের ধারে। তাই সে আজও অমর, ভেসে ওঠে ভোরের বাতাসে।

সাধনার সার্থকতা

অতীন ঘোষ (হিসাবরক্ষক)
হাজী এ.কে. খান কলেজ

"মধু আহরণে" ঘুরে বনে বনে
সন্ধান মিলিল একদিন।
যে দিকেই যায় মৌমাছি ধায়
পথিকের আশা ক্ষীণ।
ভাবিল মনে গোলাপের বনে
কাঁটা বয় পালা – পালা
পথিক ধায় তুলিবার আশায়
ভুলে যায় কাঁটারা জ্বালা
ত্যাজিল বেদনা সহিল যন্ত্রণা
যাইল চাকের কাছে।
সঞ্চিত ধন ছাড়ে কি কখন?
মৌমাছি ধায় পথিকের পাছে।।
মৌমাছি স্বরূপ যে কাঁটা
সম্পূর্ণ এসেছি ত্যাজিয়া।
ফেলেছিল খালে পুরেছিল খাঁচায়
শেষে দিল আমারে ছাড়িয়া।।
ডানা কাটা বিহঙ্গীর ন্যায়
ঘুরেছি যার দিন রাত নাই।
পাইলাম যে ধন আহরণে
সাক্ষী হয় যেন জীবন মরণে।

পৃথিবী আজ বড়ো কষ্টে

সাকিল মণ্ডল

পৃথিবী আজ বড়ো কষ্টে।
একদিকে করোনার হাহাকার
গঙ্গায় ভাসিতেছে প্রাণহীন মানুষের শব।
শ্মশানে লেগে রয়েছে মৃত্যুর লাইন।
মানুষ আজ বড়ো অসহায়
কিভাবে বাঁচাই নিজের প্রাণ।
মানুষ ছুটিতেছে অক্সিজেন ঝুলিয়ে পিঠে।

পৃথিবী আজ বড়ো কষ্টে।
অন্যদিকে আবার অদৃশ অনাহার
যাহা দেখিতে পাই না আমরা।
না জানি এই অনাহারে মরছে কত মানুষ।
যাহা যায় না গোনা, যায় না দেখা।
সরকার করেছে আদেশ
তাই আজ আমরা গৃহবন্দী।
কারোর ঘরে ফিরছে শান্তি।
কারোর ঘরে লেগেছে অশান্তি।

সত্যি পৃথিবী আজ বড়ো কষ্টে।
লেগেছে যুদ্ধের পাল্লাপাল্লি।
কেউ হচ্ছে বর্বরতার শিকার
কেউ করছে শক্তির অপব্যবহার।
পৃথিবী শিক্ষা নেয়নি দুটি যুদ্ধ দেখে
তাই হয়তো না জানি আবারও
দেখিতে হয় তৃতীয় যুদ্ধটি।
পৃথিবী আজ বড়ো কষ্টে,
মানুষ জাতি আজ ধ্বংসের পথে।

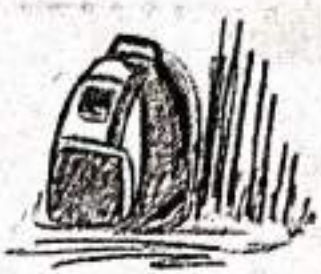

স্মৃতি

ইতিকা ঘোষ
শিক্ষা বিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

একদিন এই কলেজ ছিল
আমার প্রতিদিনের জীবন;
মুক্তঝরা সেইদিনগুলো যে
অনেক দূরে এখন।
হাত বাড়িয়ে চাই যে ছুঁতে,
পারছি না আজ আর!
অতীত দিনের মুহূর্তগুলো, তবু
ডাকছে যে বারবার।
হাসছে ক্লাসরুম, করিডর আর
ঐ যে সবুজ মাঠ;
হাজার স্মৃতির সাক্ষী হয়ে হাসছে
ওই আকাশ ছোঁয়া গাছ।
কলেজ-দিনের কবিতাগুলো
আবার মনে আসছে;
বন্ধুদের হাসি গল্পগুলো
চোখের কোণে ভাসছে।

অন্তিম সমাচার

রিমা ঘোষ
ভূগোল অনার্স

হারিয়ে যাব বহুদূরে
ফিরব নাকো আর
পাবে নাকো কেউগো আমার
অন্তিম সমাচার।
খুঁজবে আমায় হেথায়-হোথায়
ডাকবে বারংবার
শুনবো নাকো কারোর ধ্বনি
ফিরব নাকো আর।
আত্মীয়-স্বজন আছে যত
বসবে সবাই পাশে
পারলে তোমরা আটকে নিও
যদি চোখে জল আসে।
দেখব নাকো তোমাদের ওই
মায়াভরা মুখ;
শ্মশানে গিয়ে খুঁজব আমি
তারই মাঝে সুখ।
পৃথিবীতে যত পরিচিত
বন্ধু যত ছিল
বলে দিও একটি পাগল
একাই রয়েছিল।
হয়তো আমি শুনবো নাকে
কারোর বাণীটি
কিন্তু সেদিন উঠবে হেসে
আমার মুখশ্রীটি।

কবিতা

উন্নত ভারতবর্ষ

পম্পা মণ্ডল
ইংরেজি অনার্স (ফোর্থ সেমিস্টার)

মোদের দেশ ভারতবর্ষ।
এটা উন্নত দেশ সবার জ্ঞাত।
এই দেশেতেই ক্ষুধার জ্বালায়,
লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।
এই দেশেতেই অধিক ব্যক্তিবর্গ,
ভক্ষণ করে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট।
তাঁদের নেইকো বাড়ি, নেইকো ঘর, নেইকো বাসস্থান।
ভবঘুরে বেড়াই তাঁরা,
তাদের যাযাবরের জীবন।

এই দেশেতেই সুস্বাস্থ্যের অধিকার,
মনে হয় যেন মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তির দরকার।
গরিবদের জন্য নেই কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।
কারণ যে তাঁদের অর্থের শোচনীয় অবস্থা।

শিক্ষার বড়ই অভাব দেশে,
শিক্ষা ব্যবস্থা যে বেসরকারিকরণ হয়েছে।
মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তি পড়ছে তাঁরা টাকার জোরে;
হচ্ছে তারা ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার,
অন্যদিকে অর্থাভাব চলে না গরিবের সংসার।

দেশ মোদের খুবই উন্নত।
যেখানে নারীরা হয় দিনে রাতে অসহায়ভাবে ধর্ষিত।
সমাজে নেইকো তাদের কোনো নিরাপত্তা,
অসহায়তা তাঁদের করেছে গ্রাস,
নেইকো তাঁদের কোনো নিরাপদ আস্থা।

সত্যিই মোদের দেশ খুবই উন্নত।
যেখানে ধর্ম নিয়ে হয় বাড়বাড়ন্ত।
শাসক গোষ্ঠী শোষণের জন্য ধর্মকে করেছে হাতিয়ার।
হয়েছে তারা সকল ধর্মকে করে ব্যবহার।
আনাচে কানাচে শুনছি খুব দেশপ্রেমের বাণী,
সত্যিই কি এরা দেশপ্রেমিক নাকি দেশদ্রোহী?

এই দেশটি স্বাধীন মোদের,
তবু নেইকো কোনো স্বাধীনতা।
পরাধীন হয়েই বেঁচে আছি,
শোষিত হচ্ছি নিজের দেশেই।
স্বাধীনতা দিবসে তুলছি জাতীয় পতাকা,
বলছি মুখে বন্দেমাতরম।
সত্যিই কি স্বাধীন মোরা?
প্রশ্নটা খুব গভীরতম।

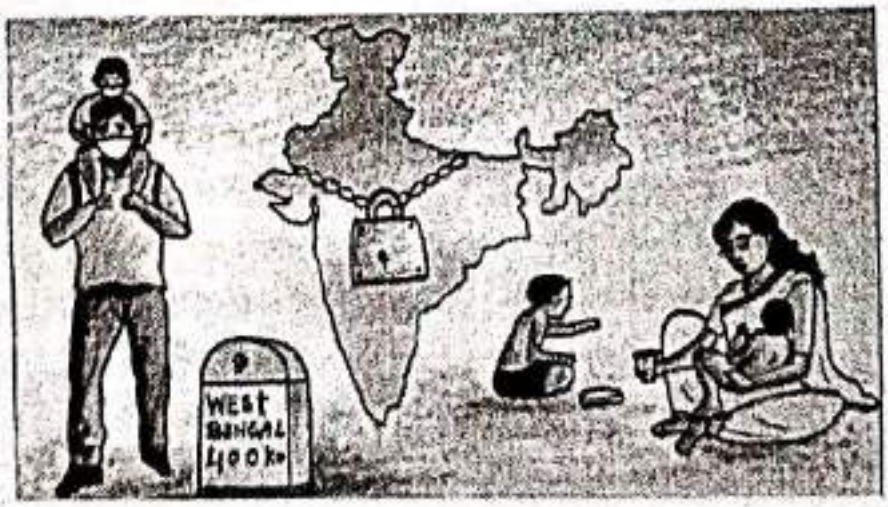

অনুগল্প

সুখের জীবন

সীমা খাতুন

দুটি মানুষ ছিল অসুস্থ। তাঁরা ছিল শ্যামনাথ ও যদু। তাঁরা দুজনেই হাসপাতালে ভর্তি ছিল। শ্যামনাথ হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকত কারণ উঠতে পারত না। আর যদু জানালার কাছে সবসময় চেয়ে থাকত। শ্যামনাথ ছিল হৃদরোগে আক্রান্ত অন্যদিকে যদু ছিল অন্ধ। অন্ধ যদু বেডে শুয়ে শুয়ে অপরদিকে শ্যামনাথকে গল্প শোনাত। যদু শ্যামনাথকে একদিন বলল, জানিস ভাই বাচ্চাগুলো না আজ মাঠে নেমেছে, ফুটবল খেলছে। একদল বাচ্চা গোল দিয়েছে ১৫, আরএকদল বাচ্চা একটাও গোল দিতে পারেনি। কিছুদিন পর যদু শ্যামনাথকে বলল, জানিস ভাই আজও বাচ্চাগুলো মাঠে নেমেছে। একটি বাচ্চা পড়ে গেল কিন্তু হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

এরপর একদিন যদু ঘুমের মধ্যে মারা গেল। তখন আর শ্যামনাথের দিন কাটত না। সময় যেন যেত না। একদিন নার্সকে বললে শ্যামনাথ, আমাকে জানালার কাছে নিয়ে চলুন। তখন তাকে জানালার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তখন শ্যামনাথ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে উঁচু একটি প্রাচীর। সে বললে, বাইরেটা দেখা যাচ্ছে না কেন? ওখানে প্রাচীর কবে হল? নার্স উত্তর দিলে, হাসপাতাল তৈরির পর থেকেই তো এখানে প্রাচীর আছে। এবারে শ্যামনাথ প্রশ্ন করল, তাহলে যদু কীভাবে দেখত আর আমাকে গল্প শোনাত? নার্স বলল, ওই লোকটি যে মারা গেল? সে তো অন্ধ ছিল। হঠাৎ থমকে গেল শ্যামনাথ। তার মনে হল, যদু অন্ধ ছিল অথচ আমাকে গল্প শোনাত। নিজে অসহায় হয়েও মনের ভেতর কষ্ট চেপে রেখেও অপরকে হাসি উপহার দেবে বলে এত বেদনা পেলেও কাউকে কিছু বুঝতে দিত না। আমি তো শুধু বিছানাতেই শুয়ে থাকতাম। কিন্তু সে তো ছিল অন্ধ তবুও সে এত ভালো মানুষ ছিল। যদু আমাকে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে আমাকে আনন্দ দিত। আসলে সে ছিল প্রকৃত সুখী মানুষ।

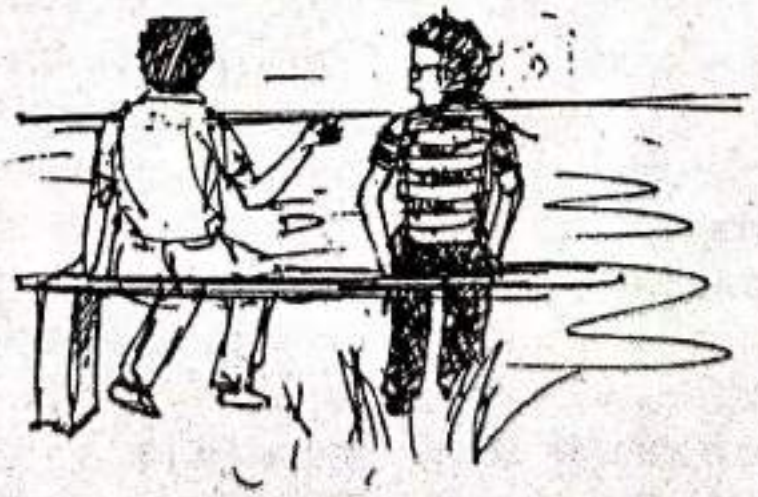

অনুগল্প

জনম দৌড়

দীপক বিশ্বাস (কর্মসূত্রে, মুর্শিদাবাদ)

ছেলেটা দৌড়াচ্ছে – ছেলেটা সকাল থেকে দৌড়াচ্ছে। সূর্যও যেন তার সাথে পাল্লা দিচ্ছে। ছেলেটা দৌড়েই চলেছে – আর তার পিছনে মোটাসোটা একটা বই হাতে একজন পুরুষ। বইয়ের মলাটের উপর লেখা 'সাধারণ জ্ঞান'। তার ঠিক পিছনে একজন নারী। যার দু'হাতে পানপাতা।

খেটে খাওয়া চেহারার আরও একজন পৌঢ়, যিনি এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন – হাতবদল যার একান্তই প্রয়োজন তিনিও দৌড়ে সামিল।

বারবার পিছন ফিরে দেখছে আর দৌড়াচ্ছে ছেলেটা। ক্রমে তার জুলপির চুল দু-একটা করে সাদা হয়ে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠছে আর কোমরে হাত চলে যাচ্ছে। তবু দৌড়ায় আর পিছন ফিরে তাকায় ছেলেটা – এখন আর তাকে ছেলে বলা মানায় না – 'লোকটা' বলাই যুক্তিযুক্ত।

এক দৌড়ে সে ছেলে থেকে লোকে পরিণত হয়ে গেল!

পিছনে আরও কিছু ভারি পায়ের ধপধপ আওয়াজ। ঘাড় বাঁকিয়ে লোকটা দেখল নানা রঙের পতাকা হাতে হোমরা-চোমরা গোছের ২-৩ টি মোষ। আর দেখেই আঁতকে উঠল! প্রাণপণে ছুটতে লাগল – পারলে ..... হার মানায়। যতটা দম আছে ততটা প্রয়োগ করে এদের বাইরে তাকে যেতেই হবে – মনে মনে ভাবে দৌড়ে মরে যাই সেও ভালো, তবু ষাঁড়ের ..... খেতে চাই না।

অনুগল্প

অতিমহামারি

পম্পা মণ্ডল, ইংরাজি অনার্স (ফোর্থ সেমিস্টার)

একদা হিমালয় পর্বতের পাশে থাকা কোন এক বনে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সুখে শান্তিতে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করছিল। হঠাৎ একদিন তাঁদের জীবনে নেমে এল এক অন্ধকার। বন্যপ্রাণীরা এক দুরারোগ্য ছোঁয়াচে মারণ রোগে আক্রান্ত হতে লাগল। এতে সমস্ত বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। বন্যপ্রাণীরা ছোঁয়াচে মারণরোগ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের বাসস্থান থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেয়। এরফলে অধিক সংখ্যক বন্যপ্রাণীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে খাদ্যের অভাবে। অন্যদিকে এই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর বন্যপ্রাণী মরে যায়। যখন বন্যপ্রাণীরা এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করে, তখন তারা জানতে পারে যে, কিছু লোভী উচ্চশ্রেণির প্রাণীর প্রাণী এই রোগের ভাইরাস ছড়িয়েছে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। যদিও সেই উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের খাবার, বাসস্থান ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উপাদানেরই অভাব ছিল না, তবুও তারা এই ভাইরাস ছড়ায় অন্যান্য প্রাণীদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য।

এই পরিস্থিতিতে বনে থাকা কিছুপ্রাচীন শাস্ত্রে বিশ্বাসী অলস প্রকৃতির শাসক শ্রেণির প্রাণী মহামারীর প্রতিকারের জন্য কিছু অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা বলে। তারা বলে গরু হল মাতা, গরু ঈশ্বরের রূপ এবং গোবর ও গোমূত্রে বিভিন্ন রকমের রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। এই বিশ্বাস নিয়ে তারা নিজেরা গোবর ও গোমূত্রে স্নান করলো ও সেইসঙ্গে অন্যান্য প্রাণীদেরও স্নান করে জীবানুমুক্ত হতে বলল। কিছু প্রাণী ব্যাপারটি মেনে নিল। কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানমনস্ক প্রাণীরা ব্যাপারটি মেনে নিল না। তবে একটা ঘটনা বুদ্ধিজীবী প্রাণীদের অবাক করে। সেটা হল – বনের রাজাও গোবর ও গোমূত্রে স্নান করার পদ্ধতিটির প্রশংসা করে এবং সাধারণ প্রাণীদের সেটি করতে বলে। এমনকি রাজা এই অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন পদ্ধতিটি মেনে নেওয়ার পাশাপাশি নিজেও কিছু অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা বলে মারণ রোগ থেকে বাঁচার জন্য। যেমন – পাঁচ মিনিট পাথরে ডাল দিয়ে মেরে শব্দ করতে হবে, দশ মিনিট বনকে অন্ধকার রেখে মশাল জ্বালাতে হবে ইত্যাদি।

অবশেষে কিছু কঠোর পরিশ্রমী, বিজ্ঞানমনস্ক প্রাণী তাদের শ্রম দিয়ে মারণ রোগের প্রতিষেধক বানালো এবং সেগুলো সাধারণ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। কথায় আছে – "মার থেকে মাসির দরদ বেশি।" বনের রাজা তার প্রজাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিষেধক না দিয়ে, পাশের বনের পশুদের বাঁচানোর জন্য প্রতিষেধকের বেশিরভাগ অংশ দিয়ে দেয়। এরফলে তার বনের পশুরা প্রতিষেধকের অভাবে মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে অধিক সংখ্যায় মরে যায়। এই পরিস্থিতিতে রাজা তাঁর বিলাসিতার জন্য ভালো বাসা বানানো ও মূল্যবান সামগ্রী জোগাড় করতে ব্যস্ত। কিছু প্রাণী এর প্রতিবাদ করলে, রাজা তার দোষটা নিচু স্তরে থাকা প্রাণীদের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং এমনভাব দেখায় যেন তাঁর কোনো দোষই নেই। এই অবস্থায় রাজার দায়িত্বহীনতার জন্য অধিক সংখ্যক বন্যপ্রাণী মারা যায় এবং বন প্রায় প্রাণীশূন্য হতে থাকে। এমতাবস্থায় বনটি, অন্যান্য বনের থেকে বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতিতে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

অবশেষে বনের পশুরা বুঝতে পারল যে, তাদের খারাপ অবস্থার জন্য তাঁদের রাজা দায়ী। তখন তারা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ করে রাজার পদচ্যুতি ঘটালো এবং নতুন নিয়মযুক্ত এলাকা গঠন করলো। এই এলাকায় সবাই রাজা এবং সবার সমান অধিকার স্থাপন হল। অবশেষে বন্যপ্রাণীরা তাদের নতুন এলাকায় সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকল এবং অন্যান্য এলাকার প্রাণীদের থেকে উন্নতিতে এগিয়ে রইল। □

অনুগল্প

চশমা

নীহারুল ইসলাম (মুর্শিদাবাদ)

প্রচণ্ড গরম।

শ্রাবণের বৃষ্টির মতো আমার শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। সেই ঘামে চোখের চশমাটা কিছুতেই চোখে থাকতে চাইছে না, বার বার পিছলে পড়ছে। হয়তো শ্রাবণ-স্রোতে কোথাও ভেসে যেতে চাইছে। আমি তা হতে দিচ্ছি না। ঠিক হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে সেটা তুলে আবার চোখে পরে নিচ্ছি। যখন বুঝতে পারলাম এই গরমে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনি আবার সেটা পিছলে কোথায় যে পড়ল, অনেকক্ষণ আর খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়েও পাগলের মতো চারপাশ হাতড়ে বেড়াচ্ছি।

হঠাৎ ল্যালহার আবির্ভাব। জিজ্ঞেস করলো কি খুঁজছো দাদা?

বললাম আমার চশমাটা রে ভাই।

ল্যালহা বলল, ওটা আর পাবে না দাদা ফালতু হাতড়ে বেড়াচ্ছ। তুমি খেয়াল করনি, ওটা কবেই স্রোতে ভেসে গেছে। শুধু ফ্রেমটা কোনমতে খড়কুটোর মতো আঁটকে ছিল। সেটাই তুমি বয়ে বেড়াতে। আজ সেটাও গেল। অবশ্য একদিক থেকে ভালোই হল, তোমার নাক কানের বোঝা অন্তত খানিকটা কমল।

অনুগল্প

কুরবানি

মহম্মদ আলামিন (মুর্শিদাবাদ)

মল্লিকা জানে কাঁঠাল পাতা চিবিয়ে অধিকাংশ সময় মন্দিরের সিঁড়িতে গা-গড়া দিয়ে জাবর কাটতে থাকে। তাকে সেখানেই পাওয়া গেল। মল্লিকা ধরে নিয়ে এল বাড়িতে। বাড়ির উঠোনে দুজন খদ্দের ও মল্লিকার বাবা দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার হাতে ছাগলটা ধরিয়ে মল্লিকা ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজার কপাটে নিজেকে কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করল। মল্লিকার কাছে শুধুমাত্র ছাগল নয়। সারাক্ষণের সঙ্গী। আদরের পাত্র।

নীল শার্ট পরা লোকটার চোখ ছাগলটাকে মেপে চলেছে – "কুরবানির ছাগল শারীরিক দিক থেকে নিখুঁত হওয়া চাই। তা না হলে কুরবানি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তবে ছাগলটা মন্দ নয়। বেশ চিকন। আর নস্যি রঙের ছাগল দেখতেও বেশ মিষ্টি। আমার পছন্দ।"

মল্লিকার বাবা আহ্লাদের সুরে বলল, "আমাদের ছাগলটা বড়ো যত্নে পুষা। ও বাড়িরই একজন। টাকার দরকার না হলে কি এ-কে বেচি?"

এরপর কয়েকটি বসার মোড়া এল। দাম-দর হলো। নীল শার্টের পকেট থেকে একতাড়া টাকা বেরিয়ে এল। ঠিক আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'তাহলে আসি' বলে নীল শার্ট পরা লোকটা উঠে পড়ল। তার সঙ্গের লোকটাও। সঙ্গের লোকটা ছাগলের দড়িটা ধরল। নীল শার্টওয়ালা ও তার সঙ্গীর পেছনে পেছনে যাবার সময় ছাগলটা একগুঁয়ে অবাধ্য শিশুর মতো তার নিজস্ব ভাষায় বিকট চিৎকারে পাড়া মাথায় করল। সে কোনও মতেই যেতে চায় না। না চাইলে কি হবে? নগদ টাকার বিনিময়ে কেনা। অর্থাৎ ছাগলটার অবাধ্য হবার চেষ্টা নিরর্থক প্রমাণিত হল। মল্লিকা এখন সম্পূর্ণ দরজার আড়ালে। অনেকক্ষণ সে মুখটা বের করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে ছিল। শূন্যতায় ভরা উঠোনের দিকে তাকিয়ে সে কি নিজেকে সামাল দিতে পারবে? না। সে পারবে না। তাই বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দু-চোখের বন্যায় বাঁধ দিতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু অনেক দূর থেকে ছাগলটার নিজস্ব ভাষার সেই কাতর আর্তনাদ যেন বারবার করে বাঁধ ভেঙে দিতে থাকল। সেই কাতর আর্তনাদের ভাষা কেবল মল্লিকা জানে। মল্লিকা এও জানে, বুকে পাথর চাপা দিয়ে প্রিয়জনের আর্তনাদকে হজম করবার নাম কুরবানি।

ছোটোগল্প

শেষ সম্বল

সাইবা সুলতানা
বাংলা অনার্স (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

সুন্দরবন এলাকার বিদ্যাধরী নদীর তীরে শ-খানেক ঘর নিয়ে গড়ে ওঠা একটি ছোট্ট গ্রাম কুটিলা। এখানকার অধিকাংশ মানুষেরই জীবিকা নদী ও বনকে কেন্দ্র করে। মাছ, কাঁকড়া, গুগলি বন থেকে মধু-কাঠ সংগ্রহ করে এরা নিজেদের পেট চালায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মধু কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে কখনও বিষাক্ত সাপ, কখনও কুমির, কখনও হিংস্র বাঘের মুখে প্রাণ হারাতে হয়। তবে বেশ কিছু মানুষ প্রতিকূলময় এই জীবিকাকে ত্যাগ করে রিকশা, ভ্যান ইত্যাদিকে নিজেদের উপার্জনের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। তবে এবারের লকডাউনে সরকারি নির্দেশে চলাচল নিষেধ হওয়ায় সব বন্ধ করে পুরোপুরি নদীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

কথায় আছে নদীর ধারে বাস ভাবনা বারো মাস। প্রকৃতি নাশিনীরূপে গর্জে উঠল। বিদ্যাধরী ফুলে ফেঁপে আছড়ে পড়ল – ঘরবাড়ি, গরু, ছাগল, মোষ ঝড়ে-জলে সব ধুয়ে মুছে গেল। ঈশ্বর এদের শেষ সম্বল টুকুও ছিনিয়ে নিল।

টিনের চাল দেওয়া ছোট্ট ঘরটির দরজার মুখেই যবুথবু হয়ে বসে আছে বছর সত্তরের একটা রুগ্ন পাতলা লোক। পরনে খাটো ময়লা লুঙ্গি, গলায় পুরোনো সবুজে রঙের একটা গামছা, তামাটে মুখটা তোবড়ানো, পেটের অংশটা ঢুকে গিয়ে পিঠে হালকা কুঁজ উঠেছে। লোকটার নাম কৈলাস। পুরো নাম কৈলাস জেলে। যদিও সে পেশায় একজন রিকসাচালক। এ উপাধি তার বাপ-দাদাদের থেকে পাওয়া।

কৈলাসের জীবনটা বড্ড কষ্টকর। গতবছর জোয়ান হৃষ্টপুষ্ট ছেলেকে বাঘে টেনে নিল। মাসখানেক আগে এন.আর.সি.'র আতঙ্কে বৌ গলায় কলসি বেঁধে নদীতে ডুবে মরল। স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাবলে কৈলাসের বুকটা ফাঁপড়ে উঠে। বুকে বড্ড ব্যথা হয়। বৌকে অনেক বুঝিয়েছিল কৈলাস কেউ তাড়াতে পারবে না ওদের। এ তাদের পিতৃভূমি। কিন্তু মোটা বুদ্ধির মেয়েছেলে বুঝলো না। ছেলে-বৌকে হারিয়ে পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের নিয়ে কুটিলায় বাস করছিল কৈলাস। এবারের ঝড়ে বিদ্যাধরীর গর্ভে বাড়িঘর সব জলাঞ্জলি দিয়ে সবাইকে নিয়ে উঁচু স্থানে ঘর বেঁধেছে।

কৈলাস খ্যাঁকখ্যাঁক করে কেশে উঠল। একদলা থুতু ফেলে গলা পরিষ্কার করে ডেকে উঠল – 'অ লতুন বো, চাট্টি মুড়ি দে কেনে, পানি দে খায়।" গত দু-দিন ধরে সত্যিই সে কিছু খায়নি। দু-দিন আগে সোম হালদারের বাড়ি একটু খিচুড়ি খেয়েছিল। তারপর আর কিছুই খাওয়া হয়নি। গতকাল ত্রাণের পড়িকটি দেওয়া হচ্ছিল। কৈলাস যেতে যেতেই তা শেষ হয়ে যায়।

ঘরের ভেতর থেকে ২৫-২৬ বছরের একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। বয়সের সঙ্গে শরীরের গঠনের বৃহৎ তফাৎ। কুচকুচে কালো বর্ণের হাট্টাগাট্টা দামড়া শরীরে খাটো শাড়ি পেঁচানো। মেয়েটা কাঁচকাঁচে গলায় বলে উঠল

– 'মিল খুলে বসে আচি? মুড়ি কুতায় পাবো। তেরানে চাট্টি পাওরুটি পেচিলাম ছেলেপিলেকে পাওয়াইচি। নিজে খেচি।'

কৈলাস মিনমিনে স্বরে বলে উঠল – 'মদন চারবেলা আচ্চে যাচ্চে, খাবার দিয়ে যাচ্চে।'

মেয়েটা কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়। শ্বশুরের মুখে নতুন প্রেমিকের কথা শুনলে লজ্জা না পেলেও সামান্য অস্বস্তি হওয়াটা স্বাভাবিক। মেয়েটা ঘরের ভেতর চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে – 'উ দিচে আমার ভাগ্যি, লয় তো ছেলেপিলেকে নিয়ে লদিতে ডুবে মত্তে হোতো। একসিকে রোজগারের মুরোদ নাই আবার আমাকে কতা শুনায়। বুড়া মরেও না। যত্তসব ঝামেলা জুটিছে আমার কপালে।'

কৈলাসের চোখে জল আসে। নিজের বউ থাকতে কতদিন সে জ্বরে পড়ে থেকেছে রোজগার করতে পারেনি, তবুও বউ কোনোদিন একটা কথাও শোনায়নি, সেবা করেছে। বড্ড ভালোবাসা ছিল দুজনের মধ্যে।

কৈলাস উঠে দাঁড়ায়। বেলগাছের তলায় রাখা রিক্সাটাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পেটের মধ্যে জ্বলে ওঠে। রিক্সা টানতে শক্তিতে কুলায় না। তবুও টানে।

রাস্তা ফাঁকা গুটি কয়েক মানুষের চলাচল। কৈলাস মোড়ে এসে দাঁড়ায়। হ্যান্ডেলে হাত রেখে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে যাত্রী পাবার আশায়। কৈলাশ... ! ডাক পেয়ে কৈলাশ পিছন ফিরে তাকায়। রাস্তার ওপারে সোম হালদার দাঁড়িয়ে।

রিক্সাটাকে রাস্তার একপাশে রেখে কৈলাশ সোম হালদারের কাছে যায়। সোম হালদার বলে ওঠে – 'রিক্সা লিয়ে বের হইচিস কেনে? জানিস না এখন পথে চলা মানা। চারিদিকে রোগ হচে। পুলিশ দু-বার করে টহল দিচে।'

'উউ.. রোগ আমাদের লা, পেট ভরা থাকলি তো রোগ হবে।' – কৈলাস বলে।

সোম হালদার সহাস্য মুখে সম্মতি জানায়।

একথা সেকথা বলতে বলতে কৈলাস ওর রিক্সার দিকে তাকায়। রিক্সা নাই। কৈলাসের বুকের ভিতর ধক করে ওঠে।

কৈলাস দৌড়ে রাস্তার এপারে আসে। পাগলের মতো সবাইকে জিজ্ঞাসা করে – 'রিক্সা কুতায়, কে লিলো গো আমার রিক্সা।'

রাস্তা চলতি একজন লোক বলে উঠে – 'পুলিশে গাড়ি তুলছিল, তুমারটাও লিয়ে গিছে মুনে হয়।'

কৈলাশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল – 'আমার রিক্সা কেনে লিয়ে যাবে, আমি তো এইকানে রেখি গেচিলাম।'

– 'বেশি দেরি না করে যাও থানায়, হাতে পায়ে ধরে লিয়ে আসো।'

কৈলাস দৌড়তে শুরু করে। দুই কিমি পথ হেঁটে-দৌড়ে কৈলাস এসে থানায় পৌঁছায়। গলায় ঝোলানো গামছাটা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে থানার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

থানার দারোগা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করে – 'কি চাই?'

কৈলাশ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে ওঠে – 'বাবু আমার রিক্সা, মোড়ে চিল, লোকে বলল থানায় লিয়ে গিচে।'

বড়োবাবু খেতে গেছেন, ওইখানে গিয়ে বসো – দারোগা কাঠকাঠ গলায় বলল।

কৈলাস এক কোণায় মেঝেতে গিয়ে বসল। বেশ কিছুক্ষণ পর খাঁকি পোশাক পরিহিত একজন পুলিশ সামনে চেয়ারে বসল। কৈলাশ উঠে দাঁড়ালো। দুহাত জোড় করে সামনে এগিয়ে গেল – 'বাবু আমার রিক্সা।'

বড়োবাবু খাতায় কিছু লিখে কৈলাশের মুখের দিকে তাকায় – 'লকডাউনে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিস কেন? জানিস না বাইরে বেরোনো নিষেধ।'

কৈলাশ বলল – এতদিন বেরোইনি বাবু। দু-দিন কিছু খাইনি। পেটের জ্বালায় বের হইচি বাবু।

বড়োবাবু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে – 'থানায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলছিস। কার্ড দেখালেই গণ্ডায় গণ্ডায় চাল-ডাল পাচ্ছিস আবার বলছিস খেতে পাস না।'

কৈলাশ আকুতির স্বরে বলে উঠল – আমার কারাড নাই বাবু। বউ-এর ছিল। ঘরের সাতে ভেসে গিচে। এই রিক্সাটাই আমার শেষ সম্বল।

বড়োবাবু আয়েসি ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে – দুহাজার টাকা ফাইন করে রিক্সা ছাড়িয়ে নিয়ে যা।

– ফাইন??

– এই যে নিষেধ করা সত্ত্বেও রিক্সা নিয়ে বের হয়েছিস তার জন্য জরিমানা। তোদেরকে এখন যদি না আটকায় পরে তো তোদেরকেই রাস্তায় মরতে হবে কি-না।

কৈলাস বড়োবাবুর পা জাপটে ধরে – 'বাবু আমার কাছে একসিকে নাই। আমি আপনার পায়ে ধরচি বাবু।'

বড়োবাবু চিৎকার করে কনস্টেবলকে ডাকে। কৈলাসকে বাইরে বের করবার হুকুম দেয়।

একজন কনস্টেবল কৈলাসকে টেনে নিয়ে যায়। দরজার বাইরে যেতে যেতে কৈলাস পেছন ফিরে তাকায়। একহাত দিয়ে চোখের পানি মুছে বলে ওঠে – 'আপনাদের এই অসুখ না হলে আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মরতে হতো না।'

ছোটোগল্প

নতুন সকালের সন্ধানে

পূজা দত্ত
বাংলা অনার্স (সেকেণ্ড সেমেস্টার)

কু-উ-উ.... ঝিক-ঝিক, ঝিক-ঝিক.... ছুটছে ছুটছে। কখনও হুশহুশ করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে ছুটন্ত কোনো গাড়িকে। একমনে তাকিয়ে আছি বাইরে। কখনও মাঠ, কখনও নদী, কখনও ছোটো শহরের বুক চিরে বেরিয়ে যাচ্ছি সামনে, আরও সামনে। মালা, মধু আর মিতা পাশে বসে অন্তাক্ষরীর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে ছুটন্ত ট্রেনের মতোই। বিরক্ত হয়ে কয়েকবার বন্ধ করতে বলেছি। প্রতিবাদ করেছি কিন্তু বন্যার খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। ওদের জগৎ থেকে আজ আমি বিচ্ছিন্ন। ভালো লাগেনি। বরং বাইরের প্রকৃতি হাতছানি দিচ্ছে, বলছে – এসো আমার সঙ্গে। আমি আছি তোমার সঙ্গে। খেলব দুজনে। খুনসুটি চলবে অনন্তকাল ধরে। ভেবো না। ট্রেনের কামরার মাঝখান দিয়ে ভিড় ঠেলে চা-ওয়ালারা মিষ্টি গলায় চা-এ-এ-এ গরম, হরেকমাল-ওয়ালারা দেখবেন নেবেন দশটাকায়? অথবা শশা-ওয়ালার – দেবো দাদা দুই টাকায় ছাল ছাড়িয়ে শুনতে খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু কোথায় যেন বেসুরো ঠেকছিল তাদের চলন। কথনে আর চলনে হকারগুলো যেন জীবন্ত কঙ্কাল।

শহরের গা ঘেঁসে গাছগুলোর পাতা বিবর্ণ। আমার মনে হল তাদের রান্নাঘর বস্তির বাড়ির মতো। গাছের ডালগুলো ঝুলে থাকা হনুমানের লেজের মতো। কি করে নিজে বাঁচবে, আমরাই বা কি করে বাঁচব। রাস্তার ধারে বেওয়ারিশ শিশুর মতো কোথাও বা তবলার মতো মাটিতে বসানো। কি জানি, কোন কালিদাস কেটে নিয়ে গেছে তার দেহ।

নদী? না নিচু জলা জমি? এ কোন ভৌগলিক পরিবেশ? সাপের এঁকেবেঁকে গেছে রেল লাইনের পাশ দিয়ে। আমি ভুল বললাম। লাইনটি হেলেদুলে দুজনে মাখামাখি করে নদীর ধার দিয়ে গেছে। বর্ষাতেও জল নেই, নদীর ধার দেহ এখানে আমাদের বাড়ির পাশের খাল-বিলের মতো। শুনেছি বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা। তাহলে কি খরা অথবা বরফগলা বন্যায় থেমে যাবে আমাদের চলা!

দূর আরো দূর ঘন কুয়াশার মত আবছা দেখা যায় দিগন্ত রেখা। এখনও তো সূর্য আকাশে চলে যায়নি পশ্চিমে। তাহলে অকাল কুয়াশা কেন? কাছে – আরো কাছে আসতেই দেখি নানান আলোর ঝলকানি; মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে টি.ভি. পর্দায় ভেসে ওঠা মহানগরীর মতো ব্যাঙের মত গজিয়ে ওঠা কলকারখানা চিমনির ধোঁয়া আর খেলোয়াড়ের হাতে মশাল জ্বালার মত সুউচ্চ স্তম্ভে সবুজ শিখা। শিহরণ জাগায়। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব তো?

মালা-মধু ধাক্কা মারে, আমি ঘুরে যাই। নিতা জড়িয়ে ধরে আমাকে। গলাটা শুকিয়ে আসে। জলের বোতলটা হাতড়াই। হাত বাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই। কোথাও কিছু ঠেকে না। দাঁড়াই, চলতে থাকি। মা বলেন – ভাবি ওঠ, ওঠ মা। দেখ জানালা খুলে, পুব আকাশে আলোর আনাগোনা।

ছোটোগল্প

অবাধ্যতার শেষ পরিণতি

রুমানা খাতুন (তৃতীয় বর্ষ, শারীরশিক্ষা)

উদয়পুর গ্রামের একটি মেয়ের নাম সারমিনা আখতার রিমি। তাকে আদর করে সকলে রিমি বলে ডাকে, এমন কি স্কুলের স্যার-ম্যামরাও। সে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। ঠাকুরদা রিমির বাবাকে ছোটো রেখে মারা যান, এজন্য তার বাবাকে ছোটো থেকেই রোজগারে নামতে হয়। সেই কারণে লেখাপড়া হয়নি তার ভাগ্যে। রিমির বাবার ইচ্ছা রিমি লেখাপড়া শিখে তার বাবার ইচ্ছা পূরণ করবে। রিমি তার বাবার একমাত্র মেয়ে। সে এখন দশম শ্রেণিতে পড়ে। রিমি পড়াশোনায় খুব ভালো; প্রতি বছর খুব ভালো রেজাল্ট করে। তাই স্যার-ম্যামদের কাছে সে খুব প্রিয়। তাদের স্কুলে নাইজু বলে এক ছেলে পড়ে। নাইজু পড়াশোনাতে ভালো না। কিন্তু সে পড়াশোনাতে ভালো না হলেও তার মনটা খুব ভালো। সে ছোটো বড়ো সবার বিপদেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপদে পড়া মানুষদের সাহায্য করতে গিয়ে যদি সে বিপদেও পড়ে তবুও সে তাদের সাহায্য করতে পিছুপা হয় না। সে নিজে বিপদে পড়ে অন্যকে সাহায্য করে। রিমিও একদিন বিপদে পড়ে, একইভাবে নাইজু রিমিকেও সাহায্য করে। নাইজুর এই মানসিকতা রিমিকে মুগ্ধ করে। রিমির এই পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ নাইজুর ভালো লেগে যায়। এই ভালো লাগা থেকে দুজনে দুজনার প্রেমে পড়ে যায়। এইভাবে বেশকিছুদিন চলার পর তাঁরা বিয়ের কথা ভাবে। এই পরিস্থিতি রিমির পড়াশুনা নষ্ট করে। এইভাবে তার বাবার সমস্ত আশা এক মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। অবশেষে একদিন তারা বিয়ে করে নিল। বিয়ের ব্যাপারটা বেশিদিন আর গোপন রইল না। একদিন সাহস করে নাইজু রিমিকে তার বাবা-মার কাছে নিয়ে যায়। তাদের এই বিয়ে নাইজুর বাবা-মা কোনোমতেই মেনে নেয় না। তার উপর নাইজু তার বাবা-মার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছে বলে তাকে তাজ্যপুত্র করে। কোনো উপায় না দেখে নাইজু সেখান থেকে চলে যায়। রিমিও জানত যে, তাদের এই সম্পর্ক তার বাবা-মাও কোনোদিন মেনে নেবে না। কারণ সে তার বাবার স্বপ্ন ভেঙেছে। তাই তারা নিজের নিজের এলাকা ছেড়ে অনেকদূরে চলে যায়। তারপর তারা একটা ভাড়াটে বাড়ির সন্ধান পায় এবং সেখানেই ওঠে। নাইজু কাজের সন্ধানে বের হয় কিন্তু সারাদিন ঘোরাঘুরির পরও সে কাজ পায় না। এমন করে সে কয়েকদিন এদিক ওদিক কাজের খোঁজ করতে থাকে এবং সে একটি ছোটোখাটো কোম্পানীতে কাজও পেয়ে যায়। তার মাসিক বেতন ঠিক হয় পাঁচ হাজার টাকা। ওরা এতেই সন্তুষ্ট এবং তাদের আনন্দে দিন কাটতে থাকে। এই আনন্দের মাঝে আর একটি খুশির খবর জানতে পারে নাইজু, যে তাঁর স্ত্রী এখন অন্তঃসত্ত্বা। তাদের সংসারে যেন আনন্দের জোয়ার আসে কিন্তু তাদের আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হল না। হঠাৎ নাইজু অসুস্থ হওয়ায় আনন্দের মোড়টাই পাল্টে যায়। রিমি, নাইজুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, তার ক্যান্সার হয়েছে। রিমি চোখের জল থামাতে পারছে না। কোনোরকমেই সে নিজেকে সামলাতে পারছে না। রিমি ভাবতে পারছে না তার এখন কি করা উচিৎ। সে তার স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে ফেরে এবং সে তার স্বামীর প্রতি খুব যত্ন নেয়। কি করলে স্বামী ভালো থাকবে এই কথা ভেবে চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে ফেলে। কোম্পানি থেকে কিছু টাকা দেয় নাইজুকে। তাই দিয়ে রিমি তার স্বামীর জন্য ঔষধ নিল এবং কিছু টাকা রেখে দেয়। এমন সময় রিমির পুত্র সন্তান হয়। এখন তাদের কাছে একটি টাকাও নেই। টাকা দিয়ে কে এখন সাহায্য করবে রিমি? তার বাবার বাড়ি কিম্বা শ্বশুর বাড়ি কোনো বাড়ির সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক নেই। রিমি এখন কি করবে? এই অবস্থায় ঔষধের অভাবে তার স্বামী মারা যায়। সেইদিনের ঘটনা চোখে দেখা যায় না। এখন রিমি তার পিতৃহারা সন্তানকে নিয়ে

কোথায় যাবে? তার ছেলের বয়স এখন মাত্র চার মাস। ওদিকে ছয় মাসের উপর বাড়ি ভাড়া বাকি হয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ির মালিক তাড়া দিচ্ছে। ভাড়া না দিলে বাড়ি ছাড়তে হবে। সে তার ছোটো ছেলের দিকে তাকিয়ে বাড়ি ছাড়তে পারছে না। সে ভাবে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। সে তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবে? কে তাকে সাহায্য করবে? বাড়ি ছাড়লে তো রাস্তায় বেরিয়ে আসতে। রাস্তায় বা সে কোথায় বা দিন কাটাবে? তাই সে মনে করল, তার থাকার মতো জায়গাটা যা করেই হোক আটকে রাখতে হবে। এদিকে রিমি মনে মনে কল্পনা করছে, যেমন করেই হোক কোনো একটা কাজ তাকে খুঁজতে হবে। সে কয়েকদিন এদিক ওদিক ঘোরার পরও কোনো কাজ পেল না। এদিকে ক্ষুধার জ্বালাও আর সইতে পারে না। তাই সে কোনো পথ দেখতে না পেয়ে, লোকের ঝি-চাকরের কাজ করবে মনস্থির করে। তারপক্ষে, ঝি-এর কাজ করে সংসার চালানো মুসকিল হয়। তবুও সে হাল ছাড়ে না। রিমি ভাবে সে ছাড়া তার ছেলের পৃথিবীতে কেউ নেই। ছেলেও তার বড়ো হচ্ছে, এভাবে কষ্টে দিন কাটাতে থাকে সে। এভাবে পাঁচ বছর কেটে যায়। এখন তার ছেলের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার সময় পার হচ্ছে। রিমির ইচ্ছে হয় ভালো স্কুলে পড়াতে কিন্তু সে তো দুবেলা দুমুঠো পেট পুরে খেতে দিতে পারে না, তাহলে ভালো স্কুল কি করে সম্ভব। রিমির ছেলের বয়স পাঁচ হতে পারে কিন্তু সে তার মায়ের দুঃখ বোঝে। তাই সে ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়ার বায়না করে না। কিন্তু তার সমবয়সীরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হচ্ছে জেনে ভীষণ কষ্ট পায়। যখন সে কষ্ট পায়, তখন সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেদিনও সে কষ্ট পেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাদের দেখে ভাবছে যদি বাবা থাকত তাহলে হয়তো এত কষ্ট করে থাকতে হত না। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারায় সে। ছুটে এসে রিমি দেখে তার ছেলে মাটিতে পড়ে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলে ডাক্তার বললেন, মাথার অবস্থা ভালো নেই। সিটি স্ক্যান করতে হবে। চিকিৎসা শুরু করতে বলে কাঁদতে কাঁদতে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে, "এটা তার প্রাপ্য না পাপের ফল?" ঈশ্বর তাকে কোন জনমের শাস্তি দিচ্ছে? নিশ্চয় সে হয়তো এর আগের জনমে কোনো পাপ করেছে, আর সেই পাপের সাজা তাকে এ জনমে পেতে হচ্ছে। নইলে কি ঈশ্বর একসঙ্গে এত পরীক্ষা করে? না অকালে তাকে স্বামী হারাতে হয়? তার শ্বশুররা ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাকে ঝি চাকরের কাজ করতে হয়। তারপর আবার তার বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল তার ছেলে; সেও এখন মৃত্যুর কোলে। এমন সময় ডাক্তার এসে বললেন, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে তাই সে কাউকে চিনতে পারছে না। অকারণে পাগলের মতো বকছে। ছেলেকে নিয়ে রিমি বাড়ি ফিরল ঠিকই কিন্তু সে ছেলেকে বেশিদিন ঘরে আটকে রাখতে পারল না। হঠাৎ একদিন কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। অনেক খুঁজেও পায় না। তার জীবনের মুহূর্তগুলো এখন তার কাছে একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়। সে ভাবে জীবন বলে সত্যিই কিছু হয় না। সে তার স্বামী ও ছেলের ভাবনায় এত শোকাকুল যে, সে বেঁচে থেকেও জীবন্ত লাশ একটা। আধো আধো কণ্ঠে ভেসে আসে একটা ছয়-সাত বছরের বাচ্চা তিন রাস্তার মোড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর দোকানের পচা খাবারগুলো কুড়িয়ে খাচ্ছে। রিমি সেখানে ছুটে যায়। ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো তিনটি ফুলের মতো নিষ্পাপ জীবন যেন কোনো দুর্বল মুহূর্তে অবাস্তব কুয়াশার কল্পনামাত্র।

নীতিকথা : বাবা-মা বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ কখনো সুখী হতে পারেনি, আর পারবেও না।

ছোটোগল্প

প্রেমের স্মৃতি

সাকিরুল মণ্ডল, বাংলা অনার্স (ফোর্থ সেমিস্টার

শ্রাবণের হালকা বৃষ্টিতে মিতু ভিজে তার রূপখানি দেখে মনে হচ্ছে – "আসমান থেকে কোনো জান্নাতি হুর নেমে এসেছে।" তার দেহখানি "হলুদে ফর্সা, ডাগর ডাগর চোখ, হালকা লম্বা, ছিপছিপে চেহারার উঠতি যুবতি।" তার "চুলের স্নিগ্ধ গন্ধ যেন বাসর রাতের নববধূর ন্যায়।" আসিফের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় গুটিয়ে তার সখির হাতখানি ধরে চলে গেল। ছোটবেলা থেকেই আসিফ ও মিতু গ্রাম্য জীবনে বেড়ে ওঠার এক অপরূপ সুন্দর জুটি। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা কবে হয়ে গেছে তারা নিজেরাও জানে না। তাদের ভালোবাসার পবিত্রতা যে কত বেশি তা সত্যকারের ভালোবাসা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

আসিফ একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলে। তার মা ছাড়া কেউই নেই। অন্যধারে মিতু গ্রামের বড়লোক বাবার সুখ, শান্তি, বিলাসিতায় বেড়ে ওঠা এক আদরের মেয়ে। তাদের এই ভালোবাসা যেন গ্রাম্য প্রকৃতির ভাষা বদলে দিয়েছে। গ্রামের সৌন্দর্য ও তাদের ভালোবাসা কত মধুর তা সবুজ ধানের ক্ষেতে ছয়টি ঋতুর সমন্বয়ে নদীর কলরব ঢেউয়ের শব্দে মিলেমিশে একাকার। তাদের ভালোবাসার টান যে কতটা তা একবেলা একে অপরের চোখের আড়াল হলেই বোঝা যেত। মিতু সখীর সাহায্যে তারা খামার বাড়ির পেছনে দেখা করত এবং চিঠির মাধ্যমে তাদের প্রেম বিনিময় হতো। এক চিঠিতে আসিফ লিখেছিল – "ওগো মোর প্রিয়তমা তোমায় পেয়ে আমি ধন্য, তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধিব গড়ব সারাজীবন, তুমি যদি হারিয়ে যাও... তাহলে হব আমি নিঃস্ব।" এইভাবে চলতে থাকে তাদের প্রেম। একদিন হঠাৎ মিতুর মা সব জানার পর মিতুকে তার ভালোবাসা ভুলে যেতে বলে, মিতু কোনো কথা না বলে নিশব্দে তার দুচোখ দিয়ে জল টপটপ করে নাক বেয়ে পড়তে থাকে। এতেই মিতুর মা বুঝতে পারল তাদের গভীর ভালোবাসা।

আসিফ সবেমাত্র বি.এ. পাস করে বি.এড. করে এস.এস.সি. পরীক্ষার অপেক্ষায় বসে আছে কিন্তু বিগত পাঁচ-ছয় বছর থেকে কোনো পরীক্ষা নেই। গ্রামের ক্ষেতে কাজ করে সংসার চালায়। তার বড়ই ইচ্ছে চাকুরি পেয়ে তার প্রিয়তমাকে বিয়ে করে সুখে সংসার করা। আশপাশ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে তাই শুনে আসিফ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। কিন্তু তার বাবা প্রশ্ন করল – "তুমি কি সরকারি চাকুরি করো? আমি যতদূর জানি তুমি একজন শিক্ষিত বেকার যুবক। আমি তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ সেদিনই দেব যেদিন তুমি সরকারি চাকুরি পাবে।" আমি চাকুরি পেয়ে আপনার মেয়েকে বিয়ে করব। আপনি আমাকে কিছুদিন সময় দিন। তুমি বলো কি আমি তোমার জন্য আমার মেয়েকে সারাজীবন রেখে দিব। আমি যতদূর জানি আগামী দশ বছর এস.এস.সি. পরীক্ষা হবে বলে আমার মনে হয় না। তুমি যেদিন চাকুরি পাবে সেদিন এসো। আর তার আগে কোনো চাকুরি সম্বন্ধ পেলে বিয়ে দিয়ে দিব।

আজ মনে হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে ছোটো মানুষ আসিফ। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও চাকুরি না পাওয়ার কারণে কেউ বিয়ে দিতে রাজি হয় না। বেকার যুবকদের এই সমাজে কোনো দাম নেই, এই ভেবে সে অপমানিত হয়ে চলে গেল। দেড় বছর পর শোনা গেল মিতুর জন্য যে পাত্র দেখা হয়েছে সে নাকি সরকারি সেনাবাহিনী তবুও মিতু রাজি নয়। মিতু তার ভালোবাসার মানুষটিকে পেতে চায়, এইদিকে আসিফ চিরদিনের জন্য তার জীবনসঙ্গীকে হারানোর কথা ভেবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে, তারপাশে আজ ওর মা ছাড়া কেউই নেই।

বিয়ের দিন মিতুকে একবার দেখার জন্য লুকিয়ে দেখতেই দেখা গেল মিতু বধূর সাজে সেজে বসে আছে, কিছুক্ষণ পর মিতু অন্য কারোর হয়ে যাবে এই ভেবে আসিফের দুচোখ দিয়ে জল পড়ছে। তার জোরে কাঁদার মতো শক্তিটুকু আজ নেই। কিছুক্ষণ পর বিয়ে করে মিতুকে নিয়ে চিরদিনের জন্য শহরে চলে গেল। মিতু হয়তো তার ভালোবাসার স্মৃতি হয়তো একদিন ভুলে যাবে। কিন্তু আসিফ এই দৃশ্য দেখার মানসিক আঘাতের কারণে স্মৃতি শক্তি হারিয়ে তার গ্রাম ও প্রেমের স্মৃতি নিয়ে মিতু ... মিতু... জগতে জগতে কোথায় চলে গেছে তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

ছোটোগল্প

একজন আদর্শ শিক্ষক

সাবনাম বানু
বাংলা অনার্স (ফোর্থ সেমিস্টার)

বাড়ির সামনের গেটের পাশে একটা নেমপ্লেট। বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা – 'ALY'S HOUSE'। নাম শুনে বা Name Plate টা দেখে হয়তো মনে হচ্ছে খুব বড়ো পরিবার তাই না? কিন্তু এই মুসলিম পরিবারের সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪ জন। বাড়ির গার্জেন জুনাব আলি আর ওনার স্ত্রী নারগিস আলি বিবি আর তাদের স্নেহের দুটি সন্তান রিয়াজ আলি ও রুহানা আলি। রিয়াজের বোন রুহানা। প্রিয় আদরের রুহানা তখন ক্লাস টেন-এর ছাত্রী, সে থাকে বোর্ডিং স্কুলে, কোনো কিছুর ছুটি পেলেই পরিবারের সঙ্গে দেখা হয় তার। ছোটোবেলা থেকেই সে পরিবারের থেকে দূরে থাকে। আর বাড়িতে শুধু থাকে রিয়াজ ও তার মা, বাবা। রিয়াজের আব্বু একজন বড়ো ব্যবসায়ী। এমন কি একে তো বড়ো ব্যবসায়ীর ছেলে, তার উপর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও পড়াশোনাও করে, ভাবই আলাদা। ফ্রেন্ডসদের নিয়ে পার্টি, ট্যুর, নতুন নতুন জামাকাপড় সবকিছু মিলিয়ে অন্যরকম একটা মস্তির লাইফ কাটছিল তার। এমনকি বন্ধুদের মধ্যে রিয়াজের একটা লিডার লিডার ভাব ছিল। তার কারণ সে সবচেয়ে বেশি খরচ করত। একদিন রিয়াজ ও তাঁর বন্ধুরা সবাই মিলে ঠিক করল সবাই মিলে কাশ্মীর যাবে ট্যুরে। আর সে তার ২০ বছরের জন্মদিনটাও সেখানেই সেলিব্রেট করবে। এরমধ্যে রিয়াজের এক বন্ধু একটু গরিব। তাদের খরচটাও রিয়াকেই বহন করতে হবে। তার আব্বু ড্রয়িং রুমে বসে কফি খাচ্ছে।

আব্বুর সামনে যেতেই রিয়াজের কিছু বলার আগেই তার আব্বু বলল – কত টাকা চাই?

রিয়াজ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল – না মানে সামনেই তো আমার জন্মদিন, তো তাই ভাবছিলাম...

রিয়াজের আব্বু একটু উচ্চস্বরে বলল – তোমাকে তো তাইই জিজ্ঞেস করছি, Amount কত?

রিয়াজ একটু ইতস্ততবোধ করে বলল – ১ লক্ষ টাকা।

রিয়াজের আব্বু রেগে গিয়ে বলল – জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান তুমি। তোমার জন্মদিনে মাত্র ১ লক্ষ টাকা খরচ করবে, একটু কম হয়ে গেল না?

এরমধ্যেই রিয়াজের আম্মি ও চলে এসেছেন। কি গো, কি হয়েছে? আরে ও তো আমাদের একমাত্র সন্তান। আমাদের যা কিছু তো একদিন সব তারই হবে। ওকে ওরকম করে বলো না Please!

রিয়াজের আম্মির এই কথার উত্তরে রিয়াজের আব্বু বলল – শোন রিয়াজের আম্মি, এই সম্পদ এক দিনে আসেনি, এর দায়িত্ব নিতেও এর যোগ্য করে তুলতে হবে নিজেকে ওকে।

– ঠিক আছে। আমি তোমার ছেলেকে ১লক্ষ টাকা দেব। কিন্তু যদি সে আগামীকাল আমাকে পরিশ্রম করে ২০০ টাকা উপার্জন করে এনে দিতে পারে।

– রিয়াজ মনে মনে ভাবল – (একটু মুচকি হেসে) আব্বু কাল দেখবে আমি তার সব সম্পত্তির দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য কি না। So funny মাত্র ২০০ টাকা।

Next Day

পরেরদিন সকাল ৭টার সময় রিয়াজের আব্বু রিয়াজকে ঘুম থেকে ডেকে দিল। কিন্তু রিয়াজ-এর খুব বিরক্ত লাগছিল, এই ভেবে যে মাত্র ২০০টাকার জন্য এত সকালে ঘুম থেকে উঠতে হল। সবকিছুর পরে সে আব্বুর কথা মতো বেরিয়ে পড়ল রেডি হয়ে। ঘর থেকে বের হবার পর এখন মনে হচ্ছে – সে একটা সমুদ্রের মাঝখানে এসে পড়ল। কী করে সে ২০০ টাকা উপার্জন করবে? সে কারো কাছ থেকে ধার করতেও পারছে না, আবার কারো সাহায্য নিতেও পারছে না।

ভাবতে ভাবতে দুপুর হয়ে গেল, তারপর শেষমেষ সে একটি মোটর বাইক গ্যারেজে গেল। সেখানে প্রতিটা বাইক মুছে দেওয়ার পরিবর্তে ৫টাকা করে পেল। এইভাবে এক এক করতে করতে সে কষ্ট করে সারাদিনে ১০৫ টাকা জমা করতে পারল।

রাত্রি হয়ে গেল, তখন সে প্রচণ্ড ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরল। তার মনে হচ্ছিল, তার শরীরও যেন তার সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছে। বাড়ি ফিরে আব্বুর সামনে দাঁড়াল। হাতে ১০৫ টাকা দিয়ে, রিয়াজ তার আব্বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল – 'আমি পারিনি আব্বু, আমি পারিনি – আমি হেরে গেলাম'।

রিয়াজ হয়তো মনে মনে ভেবেছিল তার আব্বু হয়ত তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবেন। কিন্তু তা হল না। তার আব্বু তাকে বলল – এখন আমার সাথে চলো, কোনো প্রশ্ন করবে না। আব্বুর কথা শুনে রিয়াজ একটু অবাক হলো। আমাদের বাড়ি থেকে আমরা এখন হেঁটে ৩কিলোমিটার দুরের সেতুতে যাব দুজনে – রিয়াজের আব্বু বলল।

তারা চলে গেল ব্রিজের কাছে। ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আব্বু রিয়াজকে বলল – দেখো রিয়াজ, নিচে পানি কেমন টলমল করছে। আর আজ তুমি আমার হাতে তোমার জীবনের প্রথম উপার্জন দিয়েছ তাই না?

রিয়াজ বলল – হুঁ আব্বু।

রিয়াজের আব্বু বলল – আমি জানি, এই টাকাগুলো উপার্জন করতে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এখন যা বলছি মন দিয়ে শোনো – এখন আমি তোমার প্রথম উপার্জনের এই ১০৫ টাকা দুরে পানিতে ছুঁড়ে ফেলব। আর তুমি শুনে হিসাব করে বলতে থাকবে বাকি কয়টা রইল।

আব্বুর কথা শুনে রিয়াজের চোখে পানি চলে আসল। একটা একটা করে টাকা ফেলতে থাকল। রিয়াজের আব্বু কোনোদিনও তার গায়ে হাত তোলেনি, এমনকি বকাও দেয়নি। আজ তার কেনো জানি মনে হচ্ছে – সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে তার থেকে আব্বু। কিন্তু রিয়াজের আব্বু শেষের টাকাটা ফেলল না। তারপর বলল – রিয়াজ তোমার উপার্জনের টাকাটা নষ্ট করাতে তুমি কাঁদলে, কিন্তু আমার কত টাকা তো তুমি এইভাবে নষ্ট করেছ, কই আমি তো একবারও কাঁদিনি। তোমার অনুভূতিতে যেমন কষ্ট লাগছে, আমারও ঠিক তেমনি অনুভূতি আছে কষ্ট উপলব্ধি করার জন্য। তোমার এই উপার্জনের শেষ এক টাকাটা আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত রাখব, কারণ এটা আমার ছেলের প্রথম উপার্জন। একটা পিতার জন্য একটা গর্বের প্রাপ্তি।

তুমি কাল তোমার আম্মির কাছ থেকে ১লক্ষ টাকা নিয়ে নিও। আব্বুর এই কথা শোনার পর রিয়াজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। সে আব্বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কান্না করতে করতে বলল – আব্বু আমার টাকা লাগবে না। এতদিন আমি স্কুলে কলেজে কিছুই শিখিনি। যেটা তুমি শেখালে আজ। তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আব্বু।

একজন আদর্শ বাবা, মা-র চাইতে বড়ো শিক্ষক কেউই হতে পারে না, একজন আদর্শ বাবা, মা-ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

জীবনে কখনো দুজন মানুষকে ভুলে যেও না।
১. যে তোমাকে জিতিয়ে দেবার জন্য নিজের সব কিছু হারায়। (তোমার বাবা)
২. যে তোমার সকল কষ্টে তোমার পাশে থাকে। (তোমার মা)

ছোটোগল্প

কালরাত্রি

সাবনাজ পারভিন
বাংলা অনার্স (ফোর্থ সেমিস্টার)

আজ ৭ই আগস্ট বুধবার বন্ধু সৌরভের জন্মদিন, বাড়িতে আমাকে ও স্বপ্নাকে নিমন্ত্রণ করেছে। স্বপ্না হল আমার স্ত্রী, খুব শান্ত লাজুক ও ভীতু। সন্ধ্যা ৭টায় আমরা রেডি হয়ে যাত্রা শুরু করলাম। দীর্ঘ ২৫ কিমি পথ অতিক্রম করে পৌঁছালাম সৌরভদের বাগান বাড়িতে খুব জাকজকমভাবেই পালিত হচ্ছে জন্মদিন। জন্মদিনে বাড়ি ভরা মানুষ থাকলেও বাইরেটা ছিল নির্জন গা ছমছম পরিবেশ। গাড়ি থেকে নেমেই স্বপ্না নিথরভাবে আমার হাত চেপে ধরে বলল, জানো আমার সামনে দিয়ে কি যেন একটা শনশন করে গেল। স্বপ্নাকে আমি বললাম, কি যে বলো না, কি আবার যাবে, কিছুইতো দেখলাম না। তোমার মন আসলে ভীতু। অন্ধকার পরিবেশ দেখলেই তোমার এইসব মনে হয়। চলো ভিতরে যাই। স্বপ্নার মন ওদিকেই পড়ে রইল। জন্মদিনের অনুষ্ঠানের শেষ হতে রাত্রি ১১·৪৫ বাজল। সকলে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলেও সৌরভ আমাদের দুজনকে দেরি করে দিল। এখন পরিবেশ আরও নিশ্চুপ। স্বপ্না আমার হাত ধরে রইল। বাড়ি থেকে একটি কালো বেড়াল কোথা থেকে যেন ম্যাও ম্যাও করে সামনে পড়ল। স্বপ্না ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল।

গাড়ি সৌরভের বাড়ি থেকে ৭ কিমি দূরে এসে হঠাৎ নিঝুম রাত্রিতে মাঝপথে একটা বাঁশ পড়ে আছে। নেমে বাঁশটি সরাতেই চোখে পড়ল এক আশ্চর্য দৃশ্য। দেখলাম এক ব্যক্তি একটি পুকুরে একা একা মাটি কাটছে, আমি দু-ধাপ এগোতেই দেখি ব্যক্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল, দেরি না করে গাড়ির কাছে যেতেই স্বপ্না যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। প্রথমে কিছু মনে না হলেও পরে গাড়িটাতে যেন আশ্চর্য কিছু হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ হর্ণ বাজছে, গাড়ি দুলছে এমন অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম। দুজনে শুয়ে তখন রাত ২·৩৫ হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি স্বপ্না পাশে নেই। আমার বাড়ির পাশে একটি বিশাল আম বাগান। স্বপ্নাকে খুঁজতে খুঁজতে কখন যে আমি বাগানের ভেতরে চলে গেছি তা বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ বিকট আওয়াজ। এ যেন অদ্ভুত শব্দ যা এর আগে কোনোদিন শুনিনি। শব্দ শুনে যেতেই দেখি স্বপ্না গাছের ডালে উল্টোভাবে ঝুলে রয়েছে, আলোটা তাড়াতাড়ি রেখে স্বপ্নাকে নিচে নামিয়ে এনে দেখি স্বপ্না জ্ঞান হারিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে বিছানায় স্বপ্নাকে শুইয়ে দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করছি। হঠাৎ দরজায় কে যেন ডাক দিল। আমি দরজার কাছে যেতেই স্বপ্না আমার পেছনে হতভম্ব হয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলাম। স্বপ্নাকে গায়ের মধ্যে শিহরণ দিয়ে উঠল এমন সময় চারিদিকে আজানের ধ্বনি/শব্দ কানে এল। এভাবেই কেটে গেল রাত্রিটা।

পরের দিন রাত ১২·৪০। আগের দিন রাত্রে ঘুম না আসায় সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম এমন অবস্থায় চোখ ঢুলু ঢুলু। হাতটা পাশে যেতেই লক্ষ করলাম স্বপ্না নেই। ধুসমুস করে উঠে আলো নিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাগানের দিকে। বাগানে যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল ব্যক্তিটি। স্বপ্না অজ্ঞান হয়ে গেল। দৌড়ে গেলাম। কী ছিল, কে ছিল ভেবেই গা ছমছম করল। এভাবেই কাটল সেইদিন।

১৫ আগস্ট রবিবার হঠাৎ রাত ১টায় জোরে চিৎকার। আলোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘরে থাকা একটা কূপের মধ্যে থেকে শব্দটা আসছে। হতেই আলোটি কূপের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে চারিদিক তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। কূপের থাকা নিম গাছটার মস্ত ডালটা ভেঙে পড়ল। বাতাস নেই শরীরটা শিহরণ দিল তবুও এগিয়ে গেলাম কূপের কাছে যেতে কী আশ্চর্য ব্যাপার।

আলোচনা চক্র : দুই

বিষয় : অমর একুশে

তারিখ : ২৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ (রবিবার)

আয়োজক

বাংলা বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ধারক কমিটি

হাজী এ. কে. খান কলেজ

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

অনুষ্ঠান সূচি

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা

ড. পুলকেশ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
হাজী এ.কে. খান কলেজ

১২:৩০-১২:৪০ : কথামুখ

ড. পুলকেশ মণ্ডল ও ড. ননীগোপাল মালো
যুগ্ম আহ্বায়ক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র
হাজী এ.কে. খান কলেজ, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

১২:৪০-১২:৫০ : উদ্বোধনী কথা ও স্বাগত ভাষণ

ড. চন্দ্রাণী পাল, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ও আলোচনা চক্রের সভাপতি
হাজী এ.কে. খান কলেজ, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

১২:৫০-১:০০ : উদ্বোধনী সঙ্গীত

ললিত শাহ, বাংলাদেশ বেতার ও দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী এবং
মনের মানুষ সিনেমা খ্যাত

১:০০ - ১.২০ : সূচক ভাষণ

অধ্যাপক নন্দকুমার বেরা, বাংলা বিভাগীয় প্রধান
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

আলোচক

১.২০-১.৪০

হাতেমুল ইসলাম
বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং
সভাপতি, গভর্নিং বডি,
হাজী এ.কে. খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

১.৪০-২.১০

অধ্যাপক মিজানুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ
ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

২.১০-২.২০

সাহিত্যিক মোঃ সাইফুল ইসলাম
(সুমন শিকদার),
সম্পাদক, বেগবতী
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

২.২০-২.২৫

ইনজামাম উল হক,
স্টেট এডেড কলেজ শিক্ষক
বাংলা বিভাগ,
হাজী এ.কে. খান কলেজ

২:২৫ - ২.৩০ : **ধন্যবাদজ্ঞাপন**
আব্দুর রাজ্জাক, স্টেট এডেড কলেজ টিচার
হাজী এ.কে. খান কলেজ, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

One Day Webinar
On
"Reviving Learning in Post Covid-19 Period : Reoriented Roles of Teachers"

Organised by IQAC,
HAZI A.K. KHAN COLLEGE
Date: 21-06-2020
Time: 3:00 pm – 5.00 pm

PATRON

Prof. (Dr.) Dulal Mukhopadhyaya
Former Professor, Department of Education,
University of Kalyani, Netaji Subhas Open University

RESOURCE PERSONS

Prof. (Dr.) Debjani Guha
Department of Education
University of Kalyani

Prof. (Dr.) Bijan Sarkar
Department of Education
University of Kalyani

Dr. Sumanta Kumar Saha
MD (Psychiatry)

ORGANISING COMMITTEE

President

Dr. Chandrani Pal
T.I.C.,
Hazi A.K. Khan College

Convener

Dr. Krishnendu Munsi
Coordinator, IQAC,
Hazi A.K. Khan College

Members:

Dr. Munmun Dutta
Srabonti Sarkar
Piyali Dan
Samim Aktar Molla
Bidisha Munshi
Dr. Pulakes Mandal
Dr. Nanigopal Malo
Emanuel Hansda

প্রবন্ধ

কিছু কথা, স্বপ্ন, স্মৃতিতে হাজী এ.কে. খান কলেজ

হাতেমুল ইসলাম
বিশিষ্ট সংবাদিক ও সভাপতি, গভর্নিং বডি, হাজী এ.কে. খান কলেজ

একটি এলাকা, জনপদ, সমষ্টির অধিবাসীদের উচ্চতর শিক্ষার পরিপূর্ণতা, চাহিদা সাফল্যের সোপান বেয়ে পরাকাষ্ঠায় যখন পৌছায় তখন সেখানে কলেজ গড়ে ওঠে। সমাজের প্রগতিশীলতার পক্ষে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃত শিক্ষাদানেই লুক্কায়িত সার্বিক উত্তরণের অভিমুখ। যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আর্থ সামাজিক, পরিকাঠামো। এ রকমই সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা, গঠনমূলক পরামর্শ, যৌক্তিকতা, সিদ্ধান্তের পরতে পরতে ছিল উচ্চতর শিক্ষার বাস্তববাদিতা, চিরায়ত প্রাসঙ্গিকতা ও সার্বিক অপরিহার্যতা। অবশেষে তিল তিল করে বিনির্মিত ইচ্ছাশক্তি, গঠনাত্মক ভাবনার পরিকল্পনার সুচারু রূপায়নে ঘটল হরিহরপাড়া হাজী এ.কে. খান কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। মুর্শিদাবাদ জেলার পিছিয়ে পড়া হরিহরপাড়া ব্লকে কিছুটা হলেও উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে সংযোজিত হল একটা বহু কাঙ্ক্ষিত গর্বের, সম্মানের পালক। হরিহরপাড়া হাজী এ.কে. খান কলেজ আমাদের সকলের অর্থাৎ আপামর হরিহরপাড়াবাসীর পরম গর্বের। অনেক দৌড় ঝাঁপ, প্রচেষ্টা, নিরলস ধৈর্য্য, সাক্ষাৎ, তদ্বির, তদারকির ফলশ্রুতির সুবাদে আমলাতান্ত্রিকতার অনুমতিতে প্রাপ্ত এই কলেজ।

ছাত্র জীবনে রুকুনপুর হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হলাম। সালটা ছিল ১৯৭৩। এখনকার মতো ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। কলেজ করে বহরমপুরেই ঠাঁই নিতে হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে মেয়েরা কলেজে পড়ার কথা ভাবতেই পারত না। বিশেষত হরিহরপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরা। কলেজে উপবিষ্ট হয়ে ভাবতাম আমাদের এলাকায় কলেজ থাকলে কি ভালো হতো? সেই সময়ের আমাদের স্কুলের অনেক বান্ধবী উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে আর কলেজে পড়ার সুযোগ পেল না। অনেকের বিয়ে হয়ে গেল। অনেকেই বলত, "বাড়ির অবস্থা ভালো না। তারপরে বহরমপুরে থেকে কি করে পড়বো? আর তোদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে না।" এই বিস্মৃত প্রায় কথাগুলো এখনো কানে বাজে। সেই সমস্ত মেয়েদের আকুতি, অতৃপ্ততা, অন্তরের কষ্টের কথা হয়তো বা উপলব্ধি শুনেছিলেন হরিহরপাড়ার শিক্ষা সচেতক, সমাজসেবী হাজী আব্দুল কাদের খান।

সমস্ত কিছুর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ১৯৯৮ সালে হরিহরপাড়া কলেজ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হল। হরিহরপাড়ার তদানীন্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিয়ামত হোসেন একটি জরুরী সভা ডাকলেন কমিউনিটি হলে। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ আলি হাসানকে সভাপতি আর আমাকে সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হল নবগঠিত কলেজ কমিটির।

কলেজ তো হবে, জমি দান করবে কে? হাজী আব্দুল কাদের খান বললেন, 'কলেজের জন্য আমি জমি দান করব।' পরবর্তীকালে তৎকালীন জেলা শাসক মাননীয় হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে সভাপতি করে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আবারও উদ্যোগ শুরু হল। কলেজের নামকরণ হল জমিদাতা হাজী আব্দুল কাদের খানের নামে, হাজী এ.কে. খান কলেজ। কাদের সাহেব প্রায়শই আক্ষেপের সুরে বলতেন, "মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে সমাজের উন্নতি হবে না।" আমার বাড়িতে প্রায় হাজির হয়ে একটাই কথা বলতেন – 'বেঁচে থাকতে আমি কি কলেজ দেখে যেতে পারব।" অবশেষে দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও অপেক্ষার পর ২০০৮ সালে ৮ই সেপ্টেম্বর কলেজ

সরকারী অনুমোদন লাভ করল। অবশ্য কাদের সাহেব তার আগেই প্রয়াত হন। এরপরে হরিহরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক ইনসার আলি বিশ্বাস সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে বেশ ভালোভাবেই কলেজের কাজ চালান। আমাদের একান্ত আপনজন ডঃ মুজিবর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করা হল কলেজের পরিচালনার। তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নবজন্মা কলেজকে সামনের দিকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

আবারো সেই একটি কথা হরিহরপাড়া ব্লকের আপামর মানুষের সহযোগিতা, স্বতস্ফূর্ততা ছাড়া এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। এই কলেজের ছাত্র ছাত্রে সম্পৃক্ত সাধারণ মানুষের আবেগ, ভালোবাসা। কলেজের বর্তমান সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী সমবেতভাবে মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন পরম নিষ্ঠায়। এই কলেজ যেন তাদের কাছ আপন গৃহসম। প্রতিনিয়ত তারা স্বপ্নে বিভোর, কলেজের সর্বাঙ্গীন উত্তরণের। ২০২১ সালের ৭ জুলাই স্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহন করেছেন তরুন তুর্কী ড. গৌতম কুমার ঘোষ। সৃজনশীল, গঠনমূলক ভাবনার দিশারী, কর্মমুখীন, শিক্ষামনস্ক নিবেদিতপ্রাণ উদ্যোগী ড. গৌতম কুমার ঘোষ অধ্যক্ষ হওয়ার পরেই বহুমাত্রিক চিন্তা-ভাবনার পরিকল্পনার নিখুঁত রূপায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কলেজকে নিরাপদ, নিরপেক্ষ পরিপূর্ণ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা অভয়ে, মুক্তমনে সিলেবাসের পাঠের পাশাপাশি কেরিয়ার গঠনের পাঠও নিবে। তার এই ছাত্র বান্ধব মানবিক ভূমিকাকে কুর্নিশ জানাই। তাঁর এই মহান যজ্ঞে সামিল হয়েছেন একঝাঁক কলেজের তরুণ সহকর্মী।

কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নের অনেক কাণ্ডারীই আজ পরকালে পাড়ি দিয়েছেন কালের অমোঘ নিয়মে। তন্মধ্যে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি সত্যপদ ঘোষ, আব্দুর রাকিব, নৃপেন্দ্রনাথ সাহা, আনারুল হোসেন খাঁন, আবুল হোসেন, আকরাম আলি। তাদের অবদান কলেজের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে। এখনও যারা রয়েছেন মোজাম্মেল হক প্রাক্তন এম.এল.এ., নিয়ামত হোসেন, মদন সরকার, অমরেন্দ্র উপাধ্যায়, একরাম আলি, বজলুর রহমান, নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, আব্দুল বারি, রণেন দে, বনমালি সরকার, জয়নাল আবেদীন, নজরুল ইসলাম। তারাও প্রতিনিয়ত কলেজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাতে সহযোগিতা করেছেন। ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে কলেজের কার্যকরী সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহন করতে হয়েছে। সঙ্গে আছেন হাজী এ.কে. খানের পুত্র খোদবক্স খান, জিল্লার রহমান, অরিন্দম উপাধ্যায়। এছাড়াও বর্তমান বিধায়ক নিয়ামত শেখ, জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সামসুজ্জোহা বিশ্বাস, মীর আলমগীর হোসেন (গলাশ) প্রমুখ তরুণ প্রজন্ম একে অপরের হাত ধরে হরিহরপাড়ার শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। পরিশেষে পড়াশোনা, সংস্কৃতি, সৃজনশীল চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হোক হাজী এ.কে. খান কলেজ। শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানসিক, চারিত্রিক, জীবিকামুখী নিরাপত্তার ভূমিকা পালনে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ হয়ে উঠুক আমাদের হরিহরপাড়া হাজী এ.কে. খান কলেজ। এলাকার ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষার্জনে ডিগ্রিলাভের পাশাপাশি মানুষ হয়ে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের গঠনে আদর্শ নাগরিক রূপে নিজেদের সামিল করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামীতে হরিহরপাড়া হাজী এ.কে. খান কলেজ অচিরে জেলা তথা রাজ্যের উচ্চ শিক্ষার মানচিত্রে নিজেকে সুষমভাবে মেলে ধরবে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় সৃষ্টিশীল, কর্মমুখীন মানসিকতায় ভর করে দিনগোনা শুরু।

প্রবন্ধ

কোভিড আবহে বিষময় আন্তর্জালিক জীবনযাত্রা

পাভেল আমান, সাংবাদিক : হরিহরপাড়া

শতাব্দীর প্রাণনাশক কোভিড অতিমারির সংক্রমণ শৃঙ্খল প্রতিহত করতে লকডাউনের দীর্ঘসূত্রীতার পর্যায় থেকেই গৃহ নিভৃতবাসের একাকীত্ব, একঘেয়েমি দূরীকরণে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আন্তর্জাল চরমভাবে জুড়ে গেছে। বলতে গেলে অপরিহার্য অবসর, জীবন ও মননের সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। রুটি রুজির কর্মসংস্থানে জীবন জীবিকার স্বার্থে অদৃশ্য ভাইরাসকে বগলদাবা করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। স্বাস্থ্যবিধির অনুশাসনে জীবন এখন সীমাবদ্ধ। আমরা সংক্রমণের ভয়ে সাবধানতায়, সতর্কতায় জরুরী কাজকর্ম করে আবারো গৃহের সুরক্ষা কবজে। আনলক পর্যায় পার করে নিউ নর্মালের স্বাভাবিকতায় আমরা আন্তর্জালকে অবসর যাপনের অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ক্রমশ আন্তর্জালে আষ্টেপৃষ্ঠে সম্পৃক্ত হচ্ছে আরও বেশি করে। শতাব্দীর ভয়ংকরতম অতিমারি আমাদের আন্তর্জাল নির্ভরতার মাত্রাকে গাঢ়তর করেছে। আমরা ক্রমশ আন্তর্জালের মাধ্যমেই অবসর যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফলস্বরূপ সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের এই সঙ্কটকালে প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপকরণে পরিণত হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে কোভিড সংক্রমণের দৌলতে লকডাউনের দীর্ঘসূত্রতায় সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম আমাদের অবসর জীবনের পরিসরটুকু বেশ ভালো ভাবেই দখল করেছে। আমাদের চিন্তা ভাবনা, মতামত, সৃজনশীলতার একমাত্র প্ল্যাটফর্ম এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু এই অতিমাত্রায় সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভরতার আবশ্যিকতা আমাদের কোথাও না কোথাও চিন্তা, চেতনার প্রসারে ভার্চুয়াল সম্মোহিনী বা মায়াজাল সৃষ্টিতে জন্ম নিচ্ছে অস্থিরতা, অস্বাভাবিকতা শূন্যতা, ভাবনার দৈনতা প্রভৃতি। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মনোমোহিনী দৃশ্য-শ্রাব্য জাদুতে মুগ্ধ হয়ে অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলছি নিজস্বতা, প্রযুক্তির কারসাজিতে না জেনে বুঝেই যাচাইয়ের পরোয়া না করে অমূলক ধ্যান-ধারনায় বিশ্বাস করছি, যুক্তিতর্কের পথ না মাড়িয়ে আমরা আমাদের সহজাত বিদ্বেষ, জিঘাংসা, ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং সর্বোপরি অবিশ্বাসের বাতাবরণ। আমরা কখনও ভেবে অকুলান হচ্ছি না যে এক শ্রেণির রাজনৈতিক আইটি সেল শকুনের মতো ভাগাড়ের খোঁজে উপবিষ্ট হয়ে নানা ঘটনার কারসাজিতে, বিকৃত ভিডিওতে, ছবির মাধ্যমে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রভাব, প্রসারের জন্য অহর্নিশ স্বজ্ঞানে কুমতলবের ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘৃণা, বিভাজনের বার্তা শুধুমাত্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কু-রাজনীতি। সেখানে শুধুই সামাজিক অস্থিরতা, অশান্তির বাতাবরণে অসামাজিকতার কালো ছায়া। অচিরেই অজান্তে প্রোথিত হচ্ছে আমাদের মধ্যে আসন্ন বিপদের ঘনঘটা। আমরা যেন ক্রমশ যুক্তিতর্কের ধার না ধরে অবচেতন মনণে টাঙিয়ে দিয়েছি আবিশ্বাসের সামিয়ানা। আমাদের সম্প্রীতির পীঠস্থান, সংস্কৃতি চর্চার উর্বর ভূমি, রবীন্দ্র নজরুলের বাঙালি কৃষ্টি, ঐতিহ্য, পরম্পরার ক্ষেত্র ভূমি তথা সূতিকাগার পশ্চিমবঙ্গেও এই ঘৃণ্য রাজনীতি পালে হাওয়া দিতে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন সৃষ্টি করতে, জাতিবিদ্বেষ ছড়াতে, উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে ধর্মের ঠিকাদার নিয়ে ধার্মিকতার কাজে লিপ্ত থাকতে, দেশাত্মবোধের প্রকাশ্য দিবালোকে সাম্প্রদায়িক তাস খেলে, প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতি সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যকে দক্ষিণের গোবলয়ের ব্রাহ্মণ্যবাদী, মনুবাদী রাজনীতির মাঠে মেশাতে। তবে সেই অস্থিরতা সৃষ্টিকারী রাজনীতি আমাদের শস্য-শ্যামলা সুজলা-সুফলা বাংলার চিরায়ত সম্প্রীতির বাঁধনকে ছিঁড়তে পারবে না। আবহমানকাল ব্যাপী এই বাংলা নানা ভাষা, নানা মত, সংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনা, মহাপুরুষ, জ্ঞানীগুণী মানুষের পদার্পনে

সমৃদ্ধ। তাদের পথ চলা, দর্শন আমাদের সকলের জিয়ন কাঠি। আজকের এই সংকটের সময়ে মানুষ যখন জর্জরিত রাজনৈতিক কূটকাচালি দোলাচলে দোদুল্যমান ঠিক সেই সময়ে তাঁদের সামাজিক অবদান, সর্বজনবিদিত মানবতা আমাদের সংকটের ছায়া থেকে উত্তরণের পথ দেখাবে। আমরা নিশ্চিতভাবে ঐতিহ্যের সমৃদ্ধিতে, মননশীল দার্শনিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বেলিত হয়ে দৃঢ় চিত্তে সাবলীলভাবে গুটি গুটি পায়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবো। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অনুরণিত হোক মনুষ্যত্বের নিরবধি স্পন্দন, অনুভূতি, ভাবনা চেতনার জাগরণ। আমরা আন্তর্জালের মোহে খুব বেশি নিজেদের আচ্ছন্ন যেন না করি। আমরা সবাই সোশ্যাল মিডিয়ার রাজনৈতিক অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হই। আমরা চোখ কান খোলা রেখে, যুক্তিবাদের আলোকে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবনার বিকাশে জারিত হয়ে নিজেদের বাস্তবতার আঙিনায় দাঁড় করায়। সেখানেই আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা, সার্থকতা। আমরা চাই না কোনো বিভাজন, চাই না ধর্মীয় উন্মাদনা উত্তেজনা। আমরা চাই গণতান্ত্রিক অধিকার, সম্মানে, নিরাপদে বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার। এ বিশ্বাস শুভ বোধ যেন আমাদের সবার মধ্যেই জাগ্রত হয়। আমাদের অবশ্যই চোখ, কান খোলা রেখে, যুক্তিতর্কের বিচারে, মুক্ত মানসিকতায়, অসাম্প্রদায়িক মননে, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনায় আন্তর্জালের সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। আমরা কখনই যেন স্যোশাল মিডিয়ায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে পরিচালিত না করি। কোভিডের আবহে এটাই হোক আমাদের চলমানতার সহজপাঠ। এখনো অদৃশ্য ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে আমরা মুক্ত হয়নি। দ্বিতীয় ঢেউয়ের অমানবিক বিপর্যয়, বিপন্নতার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে আমরা অস্তিত্ব সংকটে ভুগছি। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গবেষকরা নিদান দিয়েছেন অবশ্যম্ভাবী তৃতীয় ঢেউয়ের। একমাত্র কঠোর সুরক্ষা বিধির কড়াকড়িতেই আমাদের গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে বেঁচে থাকা। দেশব্যাপী গণ টিকাকরণ শুরু হলেও এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছয়নি। সেই নিরিখে আমাদের সংক্রমণের হাত থেকে জীবন-জীবিকার সুরক্ষাতে কোভিড বিধি ....

প্রবন্ধ

যতদূর মনে পড়ে

প্রলয় কুমার সাহা (কোষাধ্যক্ষ), হাজী এ.কে. খান কলেজ

সালটা ছিল ২০০৯, জীবনের কিছু না পাওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়া। ২০০৯ সালের ২৫শে জুলাই হাজী এ.কে. খান কলেজে কোষাধ্যক্ষ পদে যোগদান করলাম। কিন্তু কলেজের নিজস্ব ভবন না থাকার জন্য, স্থানীয় হরিহরপাড়া হাইস্কুলে ঐদিন সকাল সাতটার সময় হাজির হয়েছিলাম। খুবই ছোটো একঘর, যেখানে এই কলেজের প্রথম ভারপ্রাপ্ত ড. মুজিবর রহমান, ৮ জন আংশিক সময়ের শিক্ষক এবং ২ জন অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী বসতেন। সকলে ঐ অফিস ঘরে থাকলে আর কোনো জায়গা থাকত না। ড. রহমানের হাতে আমাদের এই কলেজের হাতেখড়ি বলা যায়। একে একে ৭ জন ঐদিনেই কলেজে কাজে যোগদান করেছিলাম। শুরু হল পথচলা। ঘটনাচক্রে, অধ্যক্ষ মহাশয় আমার পূর্বের কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন এবং আমার ক্লাস টিচার ছিলেন। যে কারণে আমাকে নিজস্ব কাজের বাইরেও অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হতো। যেমন, সকালবেলা কলেজ সেরে যেতে হতো জিয়াগঞ্জ রানি ধন্যাকুমারী কলেজে। কেননা যাবতীয় কাগজপত্র ধন্যাকুমারী কলেজের থেকে নিয়ে এসে বা দেখে এসে আমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করতে হতো। এইভাবে প্রায় কয়েকবছর আমাকে দুটি কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে হয়েছে।

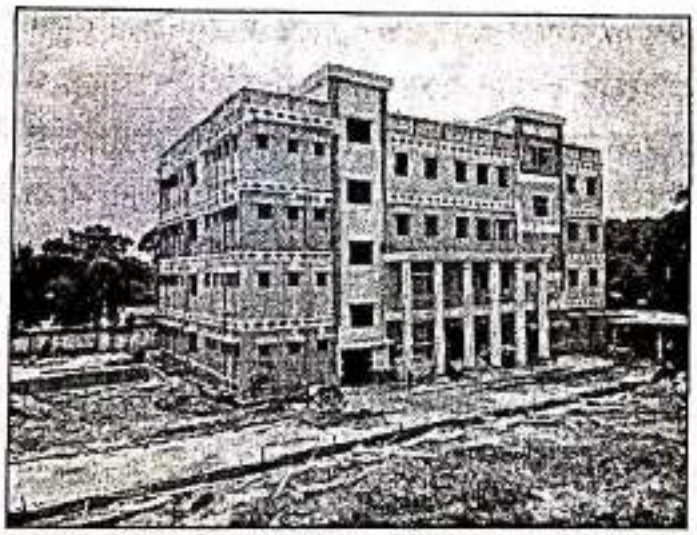

সরকারিভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৩০শে জুলাই ২০০৮ সালে যার মেমো নং 483Edn(CS)/4C-4/2001, সেখানে স্যাংশন টিচিং পোস্ট ছিল পাঁচটা ও ১টা ছিল প্রিন্সিপ্যাল, অন্যদিকে নন টিচিং পোস্ট ছিল ৭টা। এবং বিষয়গুলি ছিল বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, শিক্ষাবিজ্ঞান ও দর্শন। সবগুলি ছিল জেনারেল কোর্স।

২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ৬৩ জন ছাত্র নিয়ে হরিহরপাড়া হাইস্কুলে শুরু হয়েছিল কলেজের পথ চলা। আমি কলেজে যোগদানের প্রায় কয়েকমাসের মধ্যে কলেজের নিজস্ব ভবনে চলে আসি। সেখানে আবার শুরু হয় নতুনভাবে সাজানো। হাজি আব্দুল কাদের খান বলতেন, এলাকার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। খুবই দরকার কেননা মেয়েরা শিক্ষিত না হলে আগামী প্রজন্ম শিক্ষার আলো পাবে না। সুতরাং তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য এবং যে কারণে কলেজের জন্য জমি দান করেছিলেন। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য ও তার বাস্তবায়ন, তাঁকে সবসময় জীবিত রাখবে।

এটা খুবই মনে রাখার বিষয় যে, হাজি এ.কে. খানের জমিতে প্রতিষ্ঠিত কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয় এম.এল.এ. ইনসার আলি বিশ্বাস মহাশয় এম.এল.এ. ফান্ড থেকে এক কোটি টাকা দান করেন।

আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার প্রতিবছর আমেরিকায় যেতেন এবং সেখানে প্রায় ৪-৫ মাস থাকতেন। সেইসময় কোনো সিনিয়র টিচারকে কলেজের দায়িত্ব দিয়ে যেতেন। বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধায় মেইল-এ চিঠিপত্র

আদান-প্রদান হতো। ওনার অবর্তমানে আমাদের কলেজে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস বিষয়ে 'অনার্স' ও পলিটিক্যাল সায়েন্স বিষয়ে 'জেনারেল' আফিলিয়েশন পায় ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে। আর এই কাজের জন্য যিনি আমাদের ভীষণ সাহায্য করেছিলেন তাঁর নাম ড. অজয় অধিকারী মহাশয়। এছাড়া কলেজের জন্য বিভিন্ন সময়ে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর গুরুত্ব হাজি এ. কে. খান কলেজের কাছে অপরিসীম। পাশাপাশি আরও দুজন স্যার, যাদের কথা না বললেই নয় ড. সামসুজ্জামান আহমেদ ও অধ্যাপক সমীরবরণ দত্ত। ওনারা তিনজনেই আমাদের বর্তমান কলেজ ইন্সপেকশন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে। যে রিপোর্টের ভিত্তিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়।

২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। পরিকাঠামোর অভাবে আমরা বাধ্য হয়ে প্রথম বর্ষের ভর্তির সময় স্কুল নির্দিষ্ট করে দিতাম। যাতে ওই স্কুলগুলোর বাইরে কোনো ছাত্র ভর্তি না হয়। যদিও কলেজ নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল সাধারণের মধ্যে যে – এটি সরকারি না বেসরকারি কলেজ।

এই ধরণের প্রশ্নের মধ্যেও ছাত্রসংখ্যা কমেনি বরং বেড়েই চলছিল। কেননা পড়াশোনার মান ছিল উন্নত। এই সময়েই কলেজে কোনো পূর্ণ সময়ের শিক্ষক ছিলেন না। এছাড়া জেলার অন্যান্য কলেজের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ ভর্তি ফি নেওয়া হত। তা সত্ত্বেও ছাত্র কমেনি। ২০১১-১২ সালে আরও একটা জেনারেল সাবজেক্ট আমরা পাই, তাহল ফিজিক্যাল এডুকেশন। সেটা প্রাক্টিক্যাল বেসড বিষয়। যা ছাত্রদের নাম্বার বেশি পেতে সাহায্য করে।

আমরা কলেজে যোগদানের সময় থেকে একটি কমিটি/পরিচালন সমিতি কলেজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করে আসছে। যেখানে সম্পাদক ছিলেন ইনসার আলি বিশ্বাস মহাশয়, সভাপতি ছিলেন ব্লকের বিডিও সাহেব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এই কমিটিতে ছিলেন। তাদের ধন্যবাদ না জানালে অসম্পূর্ণ থেকে যায় এই কলেজের যাবতীয় উন্নয়ন। কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কলেজ গড়ার কারিগর। অর্থাৎ কলেজ তৈরির ভাবনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত ছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম হাজি এ.কে. খানের স্বপ্ন সফল করতে সাহায্য করেছে। আমার খুব ভালো লাগত যে এই কমিটিতে অনেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন এবং যখন কোনো সার্বিক ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া হত সকলে সহমতও পোষণ করতেন।

২০১৩ সালের শেষের দিকে কলেজ 'জাতীয় সেবা প্রকাশ' (NSS) ইউনিট তৈরি হয়। এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। যেমন : গাছ লাগানো, রক্তদান শিবির, বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার ইত্যাদি চলতে থাকে। যাতে ছাত্ররা গতানুগতিক পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ ঘটাতে থাকে। এর পাশাপাশি স্টুডেন্ট হেলথ হোম ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ট্রেনিং এবং চিকিৎসা দিয়ে থাকে। কোনো ছাত্রের প্রয়োজনে সবসময় স্টুডেন্ট হেলথ হোম হাত বাড়িয়ে দেয়। ওই বছর অর্থাৎ ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে আরো দুটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন : সংস্কৃত জেনারেল ও আরবি জেনারেল।

২০১৪ সালের শেষের দিকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. মুজিবর রহমান বয়সজনিত কারণে অবসর গ্রহণ করেন। ঠিক সেইসময় কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন – SCBC কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. প্রভাসচন্দ্র সামন্ত মহাশয়। প্রভাসচন্দ্র সামন্ত মহাশয় দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র দুবছর কলেজে ছিলেন। এবং এই দুবছরে তিনি কলেজের অনেক কিছু করে গেছেন। তিনি যোগদানের পর থেকে কলেজের একটা বড়ো সরকারি গ্রান্ট নিয়ে আসেন। যা আমাদের কলেজের ছাত্রদের খুবই কাজে লেগেছে। অন্যদিকে নতুন বিষয় হিসেবে 'ভূগোল অনার্স' ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে চালু করেন এবং ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে চালু হয় এডুকেশন অনার্স। যদিও জিওগ্রাফি ও এডুকেশন এই বিষয় দুটির আসন সংখ্যা খুবই কম। যে কারণে ছাত্রদের প্রয়োজনীয়

All Staff with Principal & President

Office staff with Principal

Department of English with Principal

Department of ENVS with Principal

Department of Sanskrit with Principa

Department of Geography with Principal

Department of Political Science

Department of History with Principal

Department of Philosophy with Principal

Department of Physical Education with Principal

Department of Education with Principal

Department of Arabic with Principal

Department of Bengali with Principal

চাহিদা মেটানো যায় না।

ড. সামন্ত তাঁর সময়ে অর্থাৎ কলেজে যোগদান থেকে ছয় মাসের মধ্যে Sanctioned Teaching Post, BCW থেকে Authenticate করিয়ে আনেন। এবং ঠিক তার পরপরই CSC Advertisement-এর ভিত্তিতে Requisition জমা করান। যার ফল স্বরূপ হাজি এ. কে. খান কলেজে Full Time Teacher পান। কলেজে প্রথম Full Time Teacher হিসাবে যোগদান করেন Dr. Munmun Dutta ২০১৬ সালের 3rd October। বর্তমানে আমরা যে নতুন ভবন দেখতে পাচ্ছি – সেটার জন্যও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সত্যি বলতে এইরকম প্রশাসক যদি সব কলেজে থাকে তবে কলেজগুলো খুবই উন্নতি করতে পারবে।

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে ড. প্রভাস সামন্ত অবসর নেন আমাদের কলেজ থেকে। সেই সময় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা হিসেবে ড. মুনমুন দত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে বাকি Full Time teacher-রা যোগদান করেন। ড. মুনমুন দত্ত খুবই কম সময় কলেজের দায়িত্বে ছিলেন। ড. দত্তের পর ড. চন্দ্রানী পাল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২০১৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ২০২১-এর ৬ই জুলাই পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন।

আরো কিছু নতুন বিষয় কলেজে চালু হয়। যেমন - Philosophy Hons, Pol Sc Hons, Geography Gen, Defence Studies-Generel, Mathamatics Gen. etc.

২০১৭ সালের ডিসেম্বর নাগাদ কলেজের পরিচালন সমিতির পরিবর্তে Administrator হিসেবে সদর SDO-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেশ কিছুদিন এই পদ্ধতি চলে। পরবর্তীকালে ২০১৮ সালের ৫ই আগস্ট গভর্নিং বডি কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ধীরে ধীরে কলেজ তার গতি বাড়িয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হলেন হাতেমুল ইসলাম মহাশয়। তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতায় কলেজ নতুনভাবে সাজতে শুরু করে।

GB গঠনের পর বেশ কয়েকটা সফল সভা হয় এবং কলেজের ১১ বছর পূর্তি উৎসব ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তার কয়েকটা মাস যেতে না যেতেই থমকে গেল উন্নয়ন। ২০২০ সালের মার্চ মাস। সবকিছু করোনার প্রকোপে বন্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল উন্নয়ন। গোটা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু মিছিল শুরু হয়।

আমরা জানি কোভিড আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে, তবুও পেয়েছি অনেক। জীবনে সুন্দর ও সুস্থবাবে বাঁচার রসদ জুগিয়েছে।

কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও কলেজের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষ ও সভাপতি মহাশয়ের অকৃপণ সহযোগিতায় কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ আনার বিষয়ে যা কিছু পদ্ধতি, সেগুলি সম্পন্ন করা হয়। এ বিষয়ে পরিচালন সমিতি ও সভাপতি মহাশয়কে শতকোটি প্রণাম। তাদের সহাযোগিতায় কলেজে, প্রথম স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে ড. গৌতম কুমার ঘোষ ২০২১ সালের ৭ জুলাই কাজে যোগদান করেন। এবার মনে হয় হাজি এ. কে. খানের স্বপ্নের পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে।

ড. গৌতম কুমার ঘোষ মহাশয়ের জন্মভূমি বর্ধমান হলেও মুর্শিদাবাদকে তিনি দীর্ঘ ২০ বছর সময় দিয়েছেন। প্রথমে তিনি বেলডাঙ্গা SRF কলেজ, পরে K.N. College-এ অধ্যাপনা করেন। কয়েক বছর আগে তিনি কলকাতার বিবেকানন্দ কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর মুর্শিদাবাদের প্রতি ভালোবাসা কলকাতায় আটকে রাখতে পারিনি। শেষপর্যন্ত সমাজের মানুষদের কিছু করার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজে ফিরে আসেন। বর্তমানে কলেজের উন্নয়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছেন। আমি খুবই ধন্য। আমার বিশ্বাস স্যারের নেতৃত্বে ও সকলের সহযোগিতায় হাজি এ. কে. খান কলেজ জেলার মডেল হিসেবে নির্বাচিত হবে। □

প্রবন্ধ

বাউল জীবন ও সঙ্গীতে সম্প্রীতির সুর

ড. পুলকেশ মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, হাজী এ.কে. খান কলেজ

পল্লীবাংলার পরতে পরতে বাউল জীবন ও সঙ্গীতে লুকিয়ে আছে সম্প্রীতির সুর। সীমান্তবর্তী এলাকায় ট্রেনে এবং বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় বাসের মধ্যে এঁদেরকে বাউল গান পরিবেশন করতে দেখা যায়। আত্মভোলা এই মানুষেরা গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে বা ভিক্ষার বিনিময়ে গান শোনায়। বিষাদগ্রস্ত পথচারিদের জীবন এদের গানে তরতাজা হয়। একতারা বা গুপিযন্ত্র বাজিয়ে খোলামেলা মনে এঁরা গান পরিবেশন করেন। এঁদের গানে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতপাতের একত্রে মিলনের বার্তা আছে। সনাতন ভারতবর্ষের খণ্ডীকরণ রুখতে হলে বাউলদের মানুষ তত্ত্বের প্রচার করতে হবে। যুগ যুগ ধরে ভারতভূমিতে বিদেশিরা ভয়ঙ্কর থাবা বসালেও বিবিধের মাঝে যে ঐক্যতা খণ্ডন করতে পারেনি। 'নানাভাষা নানামত নানা পরিধান' তবু বিবিধের মাঝে মিলনের সুর আছে। আজকের এই জাতপাতের হানাহানিতে সে স্তব্ধ, তাই বাউলদের সম্প্রীতির সঙ্গীতই পারবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে খণ্ডীকরণের হাত থেকে রক্ষা করতে।

বাউল জীবন ছাড়া বাউল গান জানা সম্ভব নয়। বাউল জীবন প্রণালীর মধ্যে সাধনা একটি মূল্যবান বিষয়। সাধনা এবং ধর্ম আলাদা বিষয়। ধর্ম বলতে আমরা বুঝি, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খ্রিস্টান আর সাধনা হল – সুফি সাধনা, সহজিয়া সাধনা, তন্ত্রসাধনা ও যোগ সাধনা। ধর্মের জন্য মানুষ একত্রিত হয়, সমাজবদ্ধ হয়। সাধনার জন্য মানুষ একা একা সমাজ থেকে অনেক দূরে চলে যায়। তবেই সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব। ধর্ম আর সমাজ একত্রিত হওয়ায় পারিবারিক, সমাজ ছেড়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ ধার্মিকদের মতে ধর্মদ্রোহ। আর এই ধর্মদ্রোহে পাশ্চাত্যের অনেক মরমী সাধকদের দণ্ড পেতে হয়েছিল তৎকালীন সময়ে।

বাউল জীবন ও সঙ্গীত সম্প্রীতির সুর নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন বাউল স্রষ্টা লালন ফকিরকে। লালন ফকির ছিলেন বাংলার মরমী সাধক। তিনি হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও মা আমিনার লালনে পালনে নতুন জীবন ফিরে পান এবং মানুষ তত্ত্বের পূজারী সিরাজ সাঁই-এর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফকির হয়েছিলেন। সিরাজ সাঁই-এর মতো দরবেশের সান্নিধ্য পাবার পর তিনি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ উপলব্ধি আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন। লালন হিন্দুঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরাজ সাঁই ফকিরের কাছে দীক্ষা নিয়ে বিধর্মী হন। এই মত তৎকালীন সময়ের সমাজপতিদের। তাছাড়া সিরাজ সাঁই-এর মতো ফকির যিনি নামাজ পড়েন না, রোজা রাখেন না, শরিয়ত মেনে চলেন না, তাদের সাধন মার্গও ইসলাম ধর্মে চলে না। সিরাজ সাঁই-এর মতো মানুষদের প্রধান অবলম্বন গান-বাজনা, নাচ এবং প্রার্থনা, উপাসনা ও উপবাস। লালন ফকির বা নজরুল ইসলাম এঁরা কেউই হিন্দু বা মুসলমান নন – এঁরা মানুষ, মানবতার পূজারী।

দরবেশ সিরাজ সাঁই প্রসঙ্গক্রমে দরবেশের আলোচনা এসে পড়ে। দরবেশের মধ্যে যাঁরা বাউল সম্প্রদায়ের, তাঁদের সাধনা ও আরাধনায় সুফি দরবেশ ছাড়াও আরও দুটি অঙ্গ বিরাজমান ছিল। এই দুটির মধ্যে একটি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা এবং সহজিয়াদের এই মানুষে – সেই মানুষ দেখা। সুফিদের সাধন সঙ্গিনী না হলেও চলে কিন্তু সহজিয়াদের চলে না। বাউলদের সাধন সঙ্গিনী গ্রাম বাংলার লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারী। বাউলদের এই সাধনা ও সৃষ্টি সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন:

"মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয়পাদ

থেকেই বাউল মতের উন্মেষ। মুসলমান মাধববিবি ও আউল চাঁদি এ মতের প্রবর্তক বলে পণ্ডিতদের ধারণা। মাধববিবি শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রই বাউল মতকে জনপ্রিয় করেন। আর উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ।"

লালনের সময়কালটা যদি উনবিংশ শতক না হতো তাহলে হয়তো লালনের মস্তকে বড় আঘাত নেমে আসত হিন্দু পুরোহিত ও মুসলমান মৌলভিদের পক্ষ থেকে। এই ধর্মীয়ধ্বজাধারী লোকেরা বার বার বাউল ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু বাংলার এই বাউল ফকিরদের সমূলে বিনাশ করা যায়নি।

বাংলার মাটিতে ততদিনে এই সাধক সম্প্রদায়ের মূল অনেক গভীরে গ্রথিত হয়েছে। বাউল ধ্বংসকে প্রতিহত করার জন্য কাজী বংশের সন্তান অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ মওলানাদের বিপক্ষে থেকে বাউলদের সমর্থন করেছিলেন। আর এই কঠিন কাজটি করার জন্য আব্দুল ওদুদকে গোঁড়া মুসলমানেরা ক্ষমা করেননি।

মরমী সাধক তার সংগীত দিয়ে সমস্ত জাতি ধর্মের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সেতু রচনা করেছিলেন। তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন জাতপাতের বিভীষিকাময় রূপটি। লালন হিন্দু না মুসলমান এই প্রশ্নের উত্তর আছে তাঁর একটি গানে :

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে।।"[১]

তিনি ছিলেন মানুষ। সবসময় মানুষের জয়গান করেছেন। ১৮৯০-এর ৩১ অক্টোবর 'হিতকরীর' নিবন্ধটিতে প্রকাশিত এই বিখ্যাত গানটি তুমুলভাবে সাড়া ফেলেছিল। বাংলার সাহিত্যের বিশেষ এক কালপর্বে কবির, রামানন্দ, চৈতন্যদেব মানুষের মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। রামকৃষ্ণদেব প্রচার করেছিলেন –

"যত মত তত পথ, কালী কৃষ্ণ, আল্লা সবই এক।"

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি – ধর্মীয় গোঁড়ামির রসানলে প্রত্যেকেই দগ্ধ হয়েছিলেন। লালনের গানে সম্প্রীতির সুর প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী গীতায় পাপের প্রতি সারথী শ্রীকৃষ্ণর উপদেশ উল্লেখ করা যেতে পারে :

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানামধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

এই মতের মূল অর্থ যুগে যুগে সাধুদের রক্ষার্থে শত্রুদের পরভূত করতে যুগাবতার ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। গৌতম বুদ্ধ-মহাবীর-যিশুখ্রিস্ট-হজরত মহম্মদ সম্প্রীতি রক্ষার্থে প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ ধর্মের বাণী শুনিয়েছিলেন। এরপর এলেন চৈতন্যদেব, গুরু নানক এবং সবশেষে লালন। ভারত তথা বাংলার লোকায়ত সাধনায় যারা পল্লী ও বাঙালিত্বকে আত্মস্থ করেছিলেন তাদের অন্যতম লালন। দিগভ্রান্ত পথিকদের সঠিক পথের দিশা দেখিয়ে বলেন :

"তুমি কার কেবা তোমার এ সংসারে।
মিছে মায়ায় মজে কেন এমন কর।।"[২]

মায়াময় এই পৃথিবীর কেউ কারো নয়। সব মিছে মায়া – স্ত্রী, পুত্র, বাবা, মা, ভাই, বোন প্রত্যেকে নিজের নিজের। কেউ কারোর জন্য নয়। আর এই মত ধ্রুব সত্য না হলে লালন আবার তার সমাজে ঠাঁই পেতেন। তিনি নিজেই নিজেকে দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামী কিভাবে মানুষকে বিপথগামী করে।

গ্রাম বাংলার ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে বাউলদের গানের সুর ঝরণা ধারার মত বয়ে চলে। বাউলদের সাধনায় মানুষ পেয়েছে সর্বোচ্চ আসন। আর এই মানুষ তত্ত্বের কথা চণ্ডীদাস বলেছিলেন :

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

চণ্ডীদাস এই মত প্রচার করেছিলেন বটে কিন্তু লালন তা প্রমাণ করলেন। মানুষের চেয়ে মহৎ কিছু নেই এটাই সত্য মানে বাউলেরা। বাউল চিন্তা ও চেতনায় ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আর বাউল ধর্ম হল মানুষের ধর্ম লোকায়ত ধর্ম। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী প্রমাণ করেছেন বাউলের সাধনা ভারতবর্ষীয় মানব সাধনার অন্তর্গত। তিনি বলেন :

"বাংলার বাউল মর্তলোকে মানুষ সাধনার

ভারতীয় ঐতিহ্যের বহমানতার অঙ্গ। ভারতের জীবচেতনায় নাস্তিক, আস্তিক, যুক্তিবাদী-ভাববাদী ছিলেন। আস্তিক শাস্ত্রবাদীদের পাশাপাশি নাস্তিক শাস্ত্রবাদী ছিলেন। লোকায়ত ঋষিগণের অবদান কম নয়।"

ধর্মীয় গোঁড়ামী যখন সমাজকে রুদ্ধ করছিল ঠিক সেইসময়ে বাউলের এই নাস্তিকবাদী মানুষতত্ত্ব সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার রোষানলে ভারতবর্ষ যখন জ্বলছে ঠিক তখনই লালনের গানে বেজে উঠেছে অসাম্প্রদায়িকতার সুর :

"একবার জগন্নাথ দেখ রে যেয়ে
জাত কেমনে রাখি বাঁচিয়ে
চণ্ডাল আনিলে অন্ন
ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে।"*

অথবা,

"ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে তার জাতের বিচার নাই।"*

বাউলদের এই সমস্ত গানে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ মুছে গেছে। তাদের বেশিরভাগ গানে নদীপারের বর্ণনা আছে, রয়েছে বদ্ধ জীবন নদী পার হওয়ার গানের বর্ণনা, নদীমাতৃক বাংলার বুকে সাধকেরা নদী পার হয়ে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে। বহু বাধা-বিপত্তি নৌকাডুবি সত্ত্বেও তারা পল্লী বাংলার পল্লব স্তূপ ঘেরা পলিমাটি নির্মিত ভূখণ্ডে যেতে চায় সাধনার জন্য। বাউলদের এই সাধনার সঙ্গে সুফি আদর্শ বোঝাতে গিয়ে "বাংলার বাউল – মহৎ ফকির লালন," লালন তিরোভাব শতবর্ষের স্মারক সংখ্যায় মানিক সরকার বলেছেন :

"লালনের কালে ভারতের লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সুফি আদর্শের সমন্বয়ে নতুন রূপ গ্রহণ করে পূর্বভারতে। লোকায়ত ঐতিহ্যে সুফি আদর্শ চৈতন্য আন্দোলন বাউল আলোড়ন প্রভৃতি বাংলার শ্রমজীবী সমাজ অর্থাৎ নিম্নবর্গের অগণিত বঞ্চিত শোষিত নরনারীর চিন্তাকাশে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে ওঠে। বঞ্চিত শোষিত জনগণ দেখিয়াছেন তাহাদের শোষকবর্গ দেব-দেবী, মন্দির-মসজিদ লইয়া মাতামাতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট এ মন্দির মসজিদ দ্যোতক তুল্য। শোষক-সমাজের আশ্রিত এবং তাহাদের বদান্যতায় পুষ্ট পুরোহিত মোল্লা গির্জার যাজক প্রমুখের মধ্যেই বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-কোরান-বাইবেল গণ্ডিবদ্ধ ছিল। এই জগতে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মানুষ গতিশীল। তাই বাউল মতে ও পথে ইহারা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইলেন।"

বাউলের সাধনা মানুষের সাধনা। মন্দির-মসজিদ-গির্জা নয় মানুষকে চিনতে হবে মানুষ হয়ে। এই মানুষের মধ্যেই সেই মহৎ সন্ধান করতে হয়। মানুষ হয়ে মানুষ ভজলে পাওয়া যাবে মানুষ রতন। বাউলের আকুলতায় সব সময় ধরা পড়ে মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের কথা :

"আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কতদিনে।"*

মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য বাউলরা আত্মহারা হয়ে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ায়। বাউলের সাধনা দেবতা নয়, তাদের সাধনা মানুষ। ধর্মীয় হানাহানি কুসংস্কার ও বিভেদ ভুলে বাউলেরা বাউল তত্ত্বে মানবিক সাম্যবাদের প্রচার করেছেন। ধর্মীয় আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের ফলস্বরূপ লালনের গান :

"সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কী হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনি চিনি কী ধরে।"*

হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রত্যেক ধর্মের মানুষদের লালন গানের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ধর্ম তৈরি করেছে। এই ধর্মীয় গোঁড়ামী ও জাতপাতের বিরুদ্ধে লালন ছিলেন প্রতিবাদের চাবুক। বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি গান রচনা করে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ঐক্যের সেতু রচনা করেছিলেন।

যুগাবতার লালন মর্ত্যভূমিতে যখন আবির্ভূত হন মর্ত্যের অসুর-দলনে তখন তার হাতে কোনো অস্ত্র ছিল

না। মর্ত্যের অসুর দলনে ভগবান কৃষ্ণের বারবার নানা অবতারে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হতে হয়েছে। কিন্তু লালন ফকির একমাত্র সঙ্গীত দিয়ে সমস্ত ধর্মের গোঁড়ামীকে দূরীভূত করে একত্রিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে বাউলেরা তাদের সঙ্গীতে ধরে রেখেছেন এখনো পর্যন্ত। বর্তমান বিশ্বের উত্তাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জাতপাতের একমাত্র বাউল সঙ্গীতের দ্বারাই দূর করা সম্ভব – এতে আছে সম্প্রীতির সুর। □

তথ্যসূত্র :

১. আবুল আহসান চৌধুরী – লালন সমগ্র – পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৫৭
২. আবদেল মান্নান – অখণ্ড লালন সংগীত – রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৫৫
৩. অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য – বাংলার বাউল ও বাউলগান – ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ১৪০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭৮০
৪. তদেব : পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬০৭
৫. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – মনের মানুষ – আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২০৭
৬. অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য – বাংলার বাউল ও বাউলগান – ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ১৪০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৪২

গ্রন্থপঞ্জী :

১. গুপ্ত অমিত – বাংলার লোকজীবনে বাউল – সংবাদ প্রকাশন কলকাতা – রথযাত্রা – ১৯৮৩
২. গুপ্ত ক্ষেত্র – বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – গ্রন্থ নিলয় কলকাতা, জুলাই - ২০০৯
৩. গুপ্ত ক্ষেত্র – বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগে সমস্যা – পুস্তক বিপণি, কলকাতা – ১৯৮৩
৪. চক্রবর্তী ড: বরুণ কুমার – বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ – অপর্ণা বুক ডিস্টিবিউটারস
৫. চক্রবর্তী সুধীর – বাংলার বাউল ফকির – পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৯
৬. চট্টোপাধ্যায় পার্থ – বাংলা সাহিত্য পরিচয় – তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯
৭. ঝা শক্তিনাথ – বাউল ফকির পদাবলি, প্রথম খণ্ড – মনফকিরা হাওড়া, ২০০৯
৮. নায়ক জীবেষ -- লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্য – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০১০
৯. প্রধান সুধী – লোকসংস্কৃতির প্রগতি – পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৮৯
১০. বেগম ড: ফিরোজা – সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির নানাদিক – বুলবুল প্রকাশনী, কলকাতা, সবেবরাত, ২০০৭
১১. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার – বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণব ইতিবৃত্ত – মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাত, ১৯৬৬
১২. বিশ্বাস তপন কুমার – লোক কবি লালন – পুস্তক বিপণি, কলকাতা – জানুয়ারি ২০০০
১৩. বিশ্বাস তপন কুমার – লোকসংস্কৃতি শোষণ ও সংগ্রাম – পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫
১৪. ভট্টাচার্য ড: আশুতোষ – বাংলা লোকসাহিত্য – ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা ১৯৭১
১৫. মিত্র গৌরি – লালন – গ্রন্থতীর্থ কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০০৭
১৬. মিত্র শ্রী সনৎ কুমার – পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা – বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ১৩৮২
১৭. সেন অঞ্জন – বাংলার লোকগান ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য – বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ২০০৯
১৮. সেনগুপ্ত পল্লব – লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ – পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ১৯৯৫
১৯. সেন সুকুমার – বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস – আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১২
২০. সরকার পবিত্র – লোকভাষা লোক সংস্কৃতি – চিরায়াত প্রকাশন, ১৪০২

প্রবন্ধ

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইনজামামউল হক, শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, হাজী এ. কে. খান কলেজ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময় বড়ো ভয়ঙ্কর। মানুষের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাসহীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন। এক বিপন্ন বিস্ময় মানুষের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে, – সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে আমরা অনেকটাই স্বচ্ছল। অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমরা কিছুটা স্বাবলম্বী। কিন্তু কোথাও যেন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। কবি সাহিত্যিকদের কলম ধরতে দেখা যায়। এরকমই একজন কবিকে আমরা পাই, তিনি হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : ১৯৩৩ - মৃত্যু : ১৯৯৫) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম। ৬০-এর দশকে যে চারজন কবিকে হাংরি আন্দোলনের জনক মনে করা হয়,তাঁদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে কবি হিসেবে নিজের স্বাতন্ত্র্য পরিচয় তুলে ধরতেই শুধু সক্ষম হননি, নিজের সুদৃঢ় একটা অবস্থানও তৈরি করে নিয়েছিলেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। কবিতার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের চিত্র নিজেই তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে সবসময় ফুটে ওঠে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

শক্তি শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও তাঁর একটি শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তবে সাহিত্যে তাঁর অনুপ্রবেশটা একটু ভিন্ন পথে। কবির শুরুটা 'কুয়োতলা' দিয়ে। তারপর কণ্টকময় কবিতার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছিলেন কাব্য দিগন্তের শেষ প্রান্তে।

আজ বড়ো দুঃসময়। করোনা অতিমারিতে মানুষের সঙ্কটকাল। অধিকাংশ মানুষ আজ কর্মহীন। মানবিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। আজ পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনও পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্যতা প্রকট হচ্ছে। আর্থিক মন্দা মানুষকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চারিদিকে অপরাধমূলক কার্যক্রম মাথাচাড়া দিচ্ছে। এহেন প্রেক্ষাপটে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আসলে

সাহিত্য তো সমাজের দর্পন। নগ্ন বাস্তবতাকে তুলে আনায় সাহিত্যের কাজ।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' কাব্যগ্রন্থের 'দাঁড়াও' কবিতার মধ্যে সেই বাস্তবতা খুঁজে পাই। কবিতার মধ্যে কবি মানবিক আবেদন রেখেছেন। মানুষের দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা কবি অনুভব করেছেন –

"মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে কবি জীবনানন্দ দাশ মানুষের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে দেখিয়েছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন –

"স্বপ্ন নয় – শান্তি নয় – ভালোবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।" (বোধ)

এরই বৈপরীত্যে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'মানুষ মানুষের জন্য' এই সারসত্যকে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায় –

"এসে দাঁড়াও, ভেসে দাঁড়াও, ভালোবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষের হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।"

একজন লেখকের লেখার মূল উৎস হচ্ছে তাঁর কল্পনাশক্তি। আর এ শক্তির উৎস হচ্ছে বাইরের জগৎ। বাইরের জগতের আনন্দ – বেদনা, হাসি-কান্না, রূপ-রস-গন্ধ সবই একজন শিল্পীর মনে দোলা দেয়। শিল্পীর মনকে উদ্বেলিত করে। জাগিয়ে তোলে মাধুর্যপূর্ণ এক নতুন ভাবানুভূতি। 'কবি ও কাঙাল' কবিতাটিতে তাঁর সেই ভাবানুভূতি ধরা পড়েছে।

"কিছুকাল সুখ ভোগ করে, হোলো মানুষের মত
মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছিল খুব।
মারা গেলে মহোৎসব করেছিল প্রকাশকগণ
কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না
সন্ধেবেলা সেজেগুঁজে এসে বলবে না, টাকা দাও
নতুবা ভাঙচুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা,
চটজলদি টাকা – নয়াতো আগুন দেবো ঘরে।
অথচ আগুনে পুড়েই গেল লোকটা, কবি ও কাঙাল।"

কবিতায় কবি অতি সাধারণভাবে কিছু মনোকথা এবং ব্যথা প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর শিল্পায়িত রূপের কারণে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। কবিতার মাধ্যমে কবি প্রকাশকদের আসল চরিত্রটি তুলে ধরেছেন। লেখকরা লেখেন কিন্তু তাঁর চিন্তার সব ফসল নিয়ে বাণিজ্য করে লাভবান হচ্ছেন প্রকাশক। সেই সঙ্গে কবি নিজেরও সমালোচনা করেছেন। কবিতা লেখা সম্মানীর জন্য কতবার ওই প্রকাশকদের বাড়িতে ধর্না দিতে হচ্ছে। কবিরাও তো কাঙাল।

সবকিছুর পরেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে ঘিরে বিপুল বিস্ময় এবং বিতর্ক বার বার পাঠকদের আন্দোলিত করেছে। বাস্তবদিকগুলো বার বার তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। কবির বোহেমিয়ান জীবন ও তাঁর বয়ে চলাও রয়ে যাবে বাঙালি পাঠকের স্মরণে চিরকাল।

SHE

Shahina Mumtaz

Through this article I would like to bring to light the two different aspects of a woman. One aspect highlights the pathetic and pitiable side of her whereas the other shows the transformed side of a woman. She has finally not been able to attain her real identity.

'She' as the name suggests is a woman. It is rightly said by someone "The hand that rocks the cradle rules the World". It is a universally accepted fact that it is she who brings life into existence, she is a mother, a wife, a sister, a daughter, a daughter-in-law, etc. Although she is capable of doing many things she is made downtrodden.

It is she who has to shoulder the burden of a family, has to take up all the assignments like education of children, cooking, housekeeping, etc. Even if both the life partners are working, she is being exploited. Pick up any newspaper, T. V. serial, matrimonial, all want **"she"**. On a broad spectrum she has become a tool in the hands of dominating people. She is expected to stretch to a capacity beyond the limits to fulfil everybody's expectations.

It is the worldwide phenomenon. A family where "she" is educated, the future generation becomes better but if **"she"** is feeble and meek, the family suffers. As someone had said "If you educate a man you educate a person, but if educate you a woman you educate a generation."

Yet there is an important point in women's life. Today when so many old restraints which chained her multifaceted talents are removed from her life, you can see more creative and better face of hers. The new woman of the 21st century radiates her glow spreading into the various fields of life. She can be a prime factor in raising her partner in the esteem of the people with whom she works. If she does it correctly, manages her associations smartly, she can be valuable in increasing the good will of his colleagues towards her partner. She can create new people and values. Only **"she"** gives to a new human being. This is an entirely new life over which she controls when she is the one who is being controlled by males all through her life. When the new lives become more dependent upon her approach, she and she alone can revolutionize the environment. She can make her influence felt more in political and social spheres too. She can make herself to direct political, local or state governments towards projects which enrich human life rather than fill political pockets. She in turn only demands **self respect**. But it must be admitted by everyone that even in the 21st century she has not attained that respect which she is actually worthy of from the society.

So finally I feel, while a man builds a house, it is **"SHE" who makes it a home.**

Inspired by my mother.
Dedicated to my beautiful maa.

Value Education and Peace Education in the 21st Century

Dr. Nanigopal Malo, Assistant Professor
Hazi A.K. Khan College

INTRODUCTION

Peace education is the process of acquiring the value, the knowledge and developing the attitude, skilis and behaviour to live in harmony with one self, with others, and with the natural environment. The adage that the pen is mightier than the sword (Edward Bulwer-Lytton, 1839) has its worth in understanding the value of a good quality education. The aim of quality education is to prepare a human being who is intelligent, knowledgeable, hard-working, efficient, disciplined, smart, successful, loving, compassionate, and to inculcate such qualities one needs to have a holistic approach of imparting education. "By education I mean an al-round drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit. Literacy is not the end of education or even the beginning" -M. K. Gandhi [Harijan: July 31, 1937]. The whole education system should include not just the school where a child receives his basic learning skills, but his total environment, his school, his family and the society of which he is an integral part. A child's mind is hungry for knowiedge and he learns from his surroundings, even more so than hisclassroom, absorbing the good and the evil of his environment.

We have made great strides in the 21st century in every sphere of life. The new innovations in the field of science and technology has seen us visiting moon, winning our fight against deadly diseases like small pox, tuberculosis, cholera, pneumonia and such others, taking gigantic leap in the field of communication by sending radio messages in search of extra stellar beings and improving communication from one end of the earth to the other with the help of mobile, satellite phones and Internet. We have made effective laws to stop the violence of racism, took measures to secure women's dignity and self-respect, and tried to imbibe the values of free speech and movement, respect of self and others. Despite all our efforts and goodwill, we still find the degradation of our value and belief systems.

The erosion ofour value system becomes evident when brilliant young minds use them to fulfill their criminal intentions. The bombings of numerous places around the world by terrorists like Al Qaeda, Lashkar-e-Toiba, and the killing of thousand of innocents by the Taliban and the ISIS, the plundering of merchant and passenger vessels by the Somali pirates, the outrageous acts of physical and mental abuse, sexual harassments on women and children all over the world are a dangerous trend of mutation and annihilation of our values. Human history is a history of wars and exploits, murders and mayhem alongwith the understanding of peace and co-operation, value of teamwork and solidarity, development of aesthetics, arts and culture, values and traditions, new innovations, always striking a balance between the two. This balance between Yin and Yang is very much essential for maintaining progress, achieving success and overall development of our world for posterity.

OBJECTIVES

- To discuss the Value Education in Indian History.
- To discuss the challenges in 21st century Education system.
- To discuss the Value Education and Peace Education.
- To discuss the role of Parents, Teachers & Society in shaping the youth.

METHODOLOGY

The study in a descriptive in nature and purely relies on secondary data sourced from various books, articles, journals, reports and website's.

Value Education in Indian History

Since the early Vedic ages, value education had its place in our Indian society and culture. In the Gurukul system of learning in those days, children were sent to Ashrams, where they used to get training required to live a full and meaningful life. Along with the important subjects of science and astrology, politics and warfare, value education at every point in their life were taught in the form of moral stories, and practical experiments. They were taught to learn to respect their elders, treat their peers as brothers, and fight for the dignity of women and to treat them as equal partners to men. Through the art of fighting, they were also taught to practice non-violence, treat children with empathy, cherish honour and dignity, and atso to love animals and not harm them without a just cause. The respect for nature was ingrained in them during their Ashram life, which was mostly spent among the natural habitats of the forest areas, where the Ashrams were located.

This system of belief and values saw a radical change during the Muslim rule in India. The calm and quiet forest life of Ashram was no longer enough to secure the dignity of motherland. The invaders, who came to India during this period, severely challenged the Indian belief system of peace and non-violence. The plundering of Indian temples, forceful conversions to Islam, kidnapping of women, killing of innocents all lead to a time of tribulations. People needed security and protection, and value education took a backseat, and wielding a sword became a necessity. The Rajputs (warrior kings) came into prominence fightmg for freedom, protecting the dignity and honour of women and children, and maintaining the general norms of tradition and culture of Hindu religion. Slowly and extensively with the rise of Mughal power over India saw a new set of value system gaining prominence.

The Mughals, unlike their predecessors were not only conquerors, but they were also keen on setting uptheir own kingdom in India. in spite offights with the Rajput kings, the Mughal emperors also develop friendship and kinship with them. It leads to an admixing of the Hindu value system with the Mughal temperament. Some of the great Mughal rulers like

Babur, Akbar, Shahjahan were great patrons ofart and architecture. During their rule, people from different views and value systems learn to reside together in peace and harmony, practising their own religion and values. The period saw the erection of beautiful monuments like the Tajmahal, Humayun's tomb, Agra fort and Red fort on one hand, and the development of art and literature in the form of beautiful works of Amir Khusrau, Omar Khayyam and such others. Singers like Tansen were considered as jewels of Emperor Akbar's court. This period also witnessed the rising of the Bhakti Movement; Rajput princess Meera Bai, a devotee of Lord Krishna, travelling saints like Kabir, Sur Das, all preached the words of peace, tolerance, dignity, honour, courage, and self-respect. They were all crucial in their own way of maintaining and inculcating values in the minds of people leading them to a path of righteousness.

The weakening of the Mughal era saw the birth of a new age. The world of opulence and religious tolerance prevailing under the Mughal rule in India saw another radical change. After the failed war of independence of 1857, the British came into power and started their rule all over India. The British East India Company were mainly traders those who travelled a tong distance to develop a colony to futher their business interests. They look upon India as a land of opportunity for harvesting cheap labour, agriculture and machinery products. The comfort and development of their subjects were never encouraged by them. They required clerks to run their offices and do their biddings and so education was limited to learning the few skills of the trade. After years of oppression under British rule and during the struEgle of freedom, men like Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, Gopal Krishna Gokhale, Raja Rammohan Roy Iswarchandra Vidyasagar all understood and stresed the importance of education. They were responsible in developing a sense of value and justice, urge the youth to fight against country's freedom in peaceful and non violent ways, and taught self reliance, dignity and self respect as cherished ideals to be treasured by all as basic human qualities.

The Challenges in 21st Century Education System

The present era has seen us facing many challenges. The world is getting fragmented with different issues like individuals getting tageed as belonging to certain groups, like racial, ethnic, religious, political and social, and these people are showing loyalty and defending their respective groups.

Science and technology have been misused for our ill gains. Earlier wars were fought using simple weapons like bows, arrows and swords. But modern technology has provided us with weapons of mass destruction; with one flick of a button we can wipe out an entire city within a few seconds. These kinds of technology in retaliatory warfare along with nuclear capability of so many countries are a threat to our very own existence.

We use nature as a means to an end for our benefit. The rampant ill use and destruction of natural resources and non renewable energy without any thought for the dangerous

consequences has seen the deadly effect with rampaging tornadoes, destructive floods, major tsunamis and earthquakes wreaking havoc all over the world. Our natural resourceslike fresh groundwater leve! and the oil and natural gas storages are also getting depleted with a rise in global pollution level. We are suffering from innumerable diseases a major fallout of the natural calamity for which we alone are responsible. But still the race is on to exploit nature for our immediate benefit and to strengthen one's economy is as steadfast as ever.

The threats posed by dictatorship in some third world nations are responsible for killing the voice of reason. As is said that power corrupts and that is so true in dictatorship which has its roots in wielding power over the weak and exploiting the needy. The true spirit of democracy can only shine through this darkness when education triumphs over our hearts driving away the erosion of values, strengthening our interpersonal bonds, awakening our compassion and foster convivial atmosphere amongst us all.

The family institution since time immemorial has played a definitive role in developing our value system and strengthening our moral backbone. Within joint family system, we had learnt the capacity of love, values of discipline, spirit of care and share, respect for all and self belief in our abilities. The disappearance of joint family system coupled with breakdown in marriages through divorce has placed our children in a situation of anxiety, insecurity and fear. They are suffering from identity crises, developing volatile anger towards their family, taking to drugs and other such criminal activities, losing interest in education, performing poorly in schools and later at jobs, developing suicidal and/or omicidal tendencies, and falling into a life of general decadence.

The general disposition of today's youth is a concern for the society, and the world at large. Prejudices, intolerance, animosity, and recklessness prevalent in our society have been responsible in creating a cruel and cavalier attitude amongst youths, ruining their moral values and resulting in hampering peace. The rise in crime rate all over the world is a direct result of this inaction of society and indifferent attitude towards all kinds of problem.

Value Education and Peace

We are all striving towards achieving success and fulfilling our life goals. Our system of education is preparing students to develop their skills so that they can be successful professionals in their respective chosen fields. So we are developing the technical knowledge of the students. We are thus failing to stress the importance of inculcating values, to temper the sharpness of our knowledge with the sweetness of our moral compass. The degradation of our values has given birth to robots and not human beings full of compassion and love, educated youths being seen falling for the charms of criminal world being lured by easy money. Success nowadays is equated with power and wealth, and to be successful people are breaking all kinds of rules with nonchalance, not fearing any consequences resulting from their actions. The crimes of forgery, theft and taking bribes have become commonplace occurrences, and we are not shocked by gruesome tales ofmurder or sexual abuse on women.

Standing at this juncture the importance of attributes of peace education (Appendix 1) respect for all, to empathize with each other's viewpoints, show appreciation of and respect for diversity, be committed to social justice, equity and equality, and nonviolence, so that there is a boost in the self esteem of young adults to meet the rising problems of social issues, and also grow a concern for the environment is monumental in shaping the moral backbone of our youth. There are three levels of Peace building for developing global society.

1. Peace building at individual level
2. Peace building at community level for developing peaceful communities, and
3. Peace building for developing global society(-Preamble to the UNESCO Constitution)

Value education can be used to imbue the attributes of peace, and it stands on thefour pillars of life-long learning concepts. They are learning to know applying general knowledge to develop self learning techniques. Learning to do applying skills to deal with situations and developing team spirit. Learning to be enabling each student to discover, expose and enrich his creative potential and Learning to five together educating students about human diversity, promoting social awareness, acceptance and respect towards others (UNESCO, 1996).

Values are those qualities which inspire people to choose the righteous path of action, and provide them with lifelong direction. They are devoid of any political, religious and philosophical influence, and are thus universal. They built attitudes which are beneficial for society and also the individual in the long run. Values which are taught at a young age can leave an everlasting impression and create enlightened persona leading to the birth of a society which can exist in peace and harmony.

Role of Parents, Teachers and Society in Shapingthe Youth

A child is educated by his surrounding environment inclusive of parents, teachers and society, all of whom moulds the child to create a better society.

Role of Parents: Parental love should not be a hindrance in the path of developing right attitudes and behavior in their children. A child should be encouraged to learn from his mistakes, and wrong attitudes should not be fostered. Value education begins within family and children from broken homes or nuclear families usually show a weakened value system and sometimes head on the road of violence and aggression. So the role of family in infusing the values of peace and morality cannot be denied.

Role of School

In today's world, schools strive for education that prepares students for productive job market. Success is equated with wealth and power acquire through education while

quality education, and value education recedes to the background. Mere transfer of theoretical and practical knowledge won't do, instead the teacher should awake originality, curiosity and positive emotions in the child. The teacher should practice what he preaches, and accept the philosophy of value education in his own life. The teachers should realize his inherent limitations and the traditional education they have received should not be an impediment while fulfiling their duties.

Role of Society

Society worships the rich and powerful. Inherent social values are not appreciated. Even mass media projects the suffering of good at the hands ofthe evil. The wrong but quick shortcut to fame, success and wealth enchants young minds. Again society has some traditional beliefs handed down generations, value education must create an inquisitive mind questioning and breaking down these prejudices. It's high time we realize as a society that technoiogy and cooperative values are equally essential in ensuring our progress.

CONCLUSION

LVEP (Living Values Education Program) is a worldwide program, providing teacher training methodologies and value based activities using which teachers and parents can develop universal values in children. Teachers are made to self assess their value system and use their imagination to include values into content and classroom. Students are engaged in activities which develop their cognitive and emotional skills through analyzing situations and generating solutions. NPE, 1986 and NCF, 2000 have stressed upon value education in educational institutions. In line with this, IIM, Kozhikode and IIM, Calcutta have incorporated courses based on values and spirituality in their curriculum. Education must encourage self assessment, power of judgment and provide all round development of individual in senses (cognitive) and sentiments (affective). Education sharpens the child's intelectual power but value education teaches him the right way to use the power.

REFERENCES

1. *Delors, J. (1996). Learning: The treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Berlin: UNESCO Publishing.*
2. *The Earth Charter. (2012). Values and Principles to Foster a Sustainable Future. The Earth Charter Initiative.*
3. *Association for Living Values Education International. (2014). (.iving Va/ue5 Education. Association for Living Values Education International. Retrieved from the website: http://www.livingvalues.net/context.html*
4. *Jindal, (2013, September). Value Based Education - Need of the Day. international lournal of Emerging Research in Management &Technology, 2(9,) 24-26. Retrieved from the website:*

প্রবন্ধ

নজরুলের কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শের প্রতিফলন

শ্রাবন্তী সরকার
সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, হাজী এ. কে. খান কলেজ

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা – চেতনা দেশ ও সমাজের প্রতি অখণ্ডতা মমতা, অসহায় অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, তাঁর দেশাত্মবোধক মনোভাব এবং সর্বোপরি মানবিক চেতনা নজরুলকে মোহিত করেছিল। নজরুল স্বামীজীর এই অপূর্ব মমত্ববোধকে স্মরণ করে লিখেছিলেন –

"আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ ভরা জলও দেখছি। শ্মশানের পথে গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলতে দেখেছি, যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি।"

নজরুল রচনা সম্ভার, হরফ, পৃষ্ঠা - ৩৬৫

স্বামীজী এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন ভারতবর্ষ মধ্যযুগের অন্ধকার ও আধুনিকযুগের আলোকিত অঙ্গনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দেখেছেন দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের নিরন্ন ছবি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ আর ছুৎমার্গ। তাঁর প্রতিটি ভাষণে বিপ্লবী কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তীব্র প্রতিবাদ এবং ধিক্কার। নজরুলেরও চিন্তা-চেতনায় ও তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের জন্যেও একই ব্যথা-বেদনা তাঁর 'দারিদ্র মোর পরম আত্মীয়' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে –

"দারিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই,
আমি যেন মোর জীবনে নিত্য কাঙালের দেখা পাই।
তাহাদের সাথে কাঁদিব তাদের বাঁধিব বক্ষে মম,
দারিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম।

নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, হরফ

ব্রিটিশ শাসনের ভয়ংকর বর্বরতা একসময় স্বামীজিকে এত ব্যথিত করেছিল যে, তিনি আলসিঙ্গা পেরুমলকে আমেরিকা থেকে চিঠি লিখেছিলেন, তার অংশ বিশেষ স্মরণযোগ্য –

"আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছে, আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশাই করেনি, তাই আমি তাদের দিয়েছি। তাঁরা যেমন ইঁট মেরেছে তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি সুদে আসলে। এখন তারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কখনও তোমাদের মতো কাপুরুষ হব না। আমি কাজ করতে করতেই মরব পালাব না।"

দেশপ্রেমিক নজরুলও একসময়ে ভারতের দুঃখ দারিদ্র-পীড়িত মানুষদের ছবি ও অত্যাচারী সুদখোর মহাজন, প্রজার রক্ত শোষণ করা বড়লোক জমিদারদের নির্যাতনের ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে চিৎকার করে বলেছিলেন:

"আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। এসব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রীমাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অসুরদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী – সুন্দর, আনন্দ সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।"

'আমার সুন্দর' – দ্রষ্টব্য, নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, হরফ, পৃষ্ঠা - ৩৩৭

স্বামীজির দেশাত্মবোধক চিন্তা ও নজরুলের দেশমাতৃকার চিন্তা – একই রেখায় সমাদৃত হয়েছে। স্বামীজির 'শূদ্র জাগরণ' চিন্তা – চেতনার সঙ্গে নজরুলের প্রতিধ্বনি 'সর্বহারা', 'কুলিমজুর' ইত্যাদি কবিতাতে ভাবসদৃশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেমন –

"তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর,
তোমারে বহিতে মুটে ও কুলি
পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি,
তারই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাহাদের ব্যথিত বক্ষে আসে নব উত্থান।

শূদ্র-শোষণের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের বিদ্রোহী চরিত্রটি নজরুলকে মুগ্ধ করেছিল। নজরুল 'আত্মশক্তি' গানটি রচনা করে বিবেকানন্দকে স্মরণ-মনন করে তাঁর উদ্দেশ্যে বন্দনা করে আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন –

"এসো বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি – বুদ্ধ-বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী ঝলক ন্যায় অসির।
তুরীয়ানন্দে ঘোষ যে আজ –
পুরুষ রাজ; সেই স্বরাজ –
জাগ্রত কর নারায়ণ নর – নিদ্রিত বুকে মোর বাঁশির,
আত্ম-ভীত এ অচেতন চিতে জাগো
'আমি' স্বামী নাঙ্গা শির।"

নজরুল রচনা সম্ভার, হরফ

ব্রিটিশ শক্তিকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে দেশবাসীর চিত্তে বিপ্লবের মন্ত্র জাগরিত করার এক মহান সত্ত্বার প্রতীক ছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। ক্লীবত্বের কারাগার থেকে বন্দী ভারতবর্ষকে জাগাতে সংগ্রামী যোগী মহান ভারতাত্মার মূর্ত পুরুষ স্বামীজির উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন –

"কোথা সে পূর্ণসিদ্ধ ও যোগী
দেখেছ কি তাঁরে?
দনুজ-দলনী-শক্তিরে পুনঃ
ভারতে জাগাতে পারে।"

'কোথা সে পূর্ণ যোগী', নজরুল রচনা সম্ভার অল্প কতার চিন্তনে নজরুল এবং স্বামী বিবেকানন্দকে তুলে ধরা যায় না। উভয়ের দেশাত্মবোধক চিন্তা তুলে ধরতে গেলে তা আস্ত একটা গবেষণাপত্র হয়ে উঠবে। এখানে আমি কেবলমাত্র সমুদ্রে নিমজ্জমান একটি আস্ত পাহাড়ের চূড়ার একটুখানি ঝাপসা ছবি তুলে ধরলাম মাত্র। ভারতমাতার উজ্জ্বল রত্ন দুই সন্তান – একজন বাণী সমৃদ্ধতায় আর একজন কবিতায়।

তথ্য সূত্র : 'বাঙলার নবজাগরণ এবং সাহিত্যে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ' – শ্যামল কুমার চক্রবর্তী

নাটক

"পাট-রানী"

সামিম আকতার মোল্লা, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

-: চরিত্রাবলী :-

আয়েশা (কলেজ ছাত্রী) — আয়েশার মা
আয়েশার বাবা — পম্পা (আয়েশার সহপাঠিনী)
অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী — স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাবৃন্দ
প্রথম সরকারি আধিকারিক — দ্বিতীয় সরকারি আধিকারিক

প্রথম দৃশ্য

(আয়েশাদের বাড়ির উঠোন)

আয়েশা : (ঘাড়ের ব্যাগটা ঠিক করে নিতে নিতে ও জুতো পরতে পরতে) মা, আমি পারব।

মা : (নেপথ্যে) কিন্তু তুই একা, অতটা রাস্তা যেতে পারবি মা?

আয়েশা : হ্যাঁ মা, আমি পারব।

আয়েশার মা : (একটি টিফিন বক্স আঁচলে মুছতে মুছতে) কিন্তু তোর আব্বা বলছিল কলেজটা নাকি অনেকটা দূরে। (টিফিন বক্সটা আয়েশার হাতে দিল)

আয়েশা : না না, খুব বেশি দূর না। ভর্তির দিন আব্বার সাথে গেলাম তো। হেঁটে কতক্ষণ? ঐ মিনিট কুড়ি পঁচিশ লাগবে। ... কি দিলে এতে?

আয়েশার মা : কি আর আছে দেবার মতো! দুটো পরোটা...

আয়েশা : (আনন্দে) পরোটা!

আয়েশার মা : আর একটু গুড়। (আয়েশা সানন্দে মাথা নেড়ে টিফিন বক্সটা ব্যাগে ভরে) কলেজে সবাই কত্ত কি খাবে। তোর আব্বা বলছিল ঐ কলেজটাতে কেন্টিন না কি একটা দোকান আছে সেখানে কত্ত ভালো ভালো দামি দামি খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে দশটা টাকাও...

আয়েশা : (মায়ের দুই হাত ধরে) মা, আমার পরোটা ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে – তুমি তো জানো। আর টাকা নিয়ে আমি কি করব? আর তাছাড়া আমার কাছে ঐ একশো টাকা তো আছেই।

মা : (আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে) যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করে তো কিনে খাস মা।

আয়েশা : আচ্ছা মা, তা খাব। তুমি মন খারাপ কোরো না তো। বেশ, আমি আসছি তাহলে।

মা : সাবধানে যাস মা।

(আয়েশা মাথা নেড়ে প্রস্থানে উদ্যত হয়ে দরজার কাছে যেতেই আয়েশার বাবা হাতে-গায়ে কাদামাখা অবস্থায় প্রবেশ করে। তার মাথায় এক বোঝা পাটগাছ।)

আয়েশার বাবা : (নেপথ্যে) আয়েশার মা, ও আয়েশার মা, আয়েশা কি চলে গেছে কলেজে? (প্রবেশ)

আয়েশা : (অবাক হয়ে) আব্বা! তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে? সব পাট জাক দেওয়া হয়ে গেল?

আয়েশার বাবা : সে না-হোক। কিন্তু আমার মেয়ে আজ প্রথমদিন কলেজে যাচ্ছে, আমি না এসে পারি।

আয়েশা : তাই বলে তুমি কাজ ফেলে... আগে বোঝাটা তো নামাও মাথা থেকে।

আয়েশার বাবা : ও হ্যাঁ, তাইতো। আসলে আনন্দে ভুলেই গেছি। (আয়েশার বাবা বোঝাটা নামাতে উদ্যত হলে আয়েশা হাত লাগাতেই আয়েশার বাবা বাধা দেয়) না, না, তোমার জামা-কাপড়ে কাদা লেগে যাবে মা। (আয়েশা বাধা অমান্য করে বোঝাটায় হাত লাগায়)

আয়েশা : তাতে কি হয়েছে? তোমার যে সারা গায়েই কাদা লেগে আছে আব্বা।

আয়েশার বাবা : আমি চাষা মানুষ। কিন্তু তুমি তো এখন কলেজের ইস্টুডেন।

আয়েশা : (মৃদু অভিমানী কণ্ঠে) তাহলে আবার যাব-ই না যাও। (বসে পড়ে)

আয়েশার বাবা : না না মা, রাগ করে না। আমি তো মজা করছিলাম। (মাথায় হাত বুলিয়ে) যাও, কলেজে যাও। আমাদের বংশে তুমিই প্রথম কলেজে পড়বে। আলহামদুলিল্লাহ। যাও মা, নিজের পরিচয় তৈরি করো।

আয়েশা : ইনশাহআল্লাহ! আচ্ছা, আমি তাহলে আসি। খোদা হাফেজ। (প্রস্থান)

আয়েশার মা ও বা একত্রে : খোদা হাফেজ।

আয়েশার বাবা : (দাওয়ায় বসে) আয়েশার মা, আজ কি আনন্দের দিন গো। আমাদের আয়েশা আজ প্রথম কলেজে যাচ্ছে।

আয়েশার মা : সবই খোদার দয়া। – আচ্ছা তুমি কি কিছু খাবে?

আয়েশার বাবা : উম... নাহ্। এক গেলাস পানি দাও।

আয়েশার মা : হ্যাঁ, দিই।

(আয়েশার মা জল আনতে ভিতরে গেল। আয়েশার বাবা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সদর দরজার দিকে যেদিকে আয়েশা প্রস্থান করেছে।)

আয়েশার মা : এই নাও,পানি। (আয়েশার বাবা অন্যমনস্ক) কই গো, ধরো।

আয়েশার বাবা : অ? ও হ্যাঁ। দাও। (আয়েশার বাবা জল পান করে।)

আয়েশার মা : কি গো, কি ভাবছিলে?

আয়েশার বাবা : কই, কিছু না তো।

আয়েশার মা : এ বছর পাটের দর ভালো নয় বলো?

আয়েশার বাবা : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কোন বছরই বা ভালো থাকে? (গায়ে-কাপড়ে লেগে থাকা কাদা ঘষে তুলতে তুলতে) বর্ষার অভাবে না ভালো ফলন হলো, না জাক দেওয়ার জায়গা পাচ্ছি। কটা টাকা সরিয়ে রেখেছিলাম; ভেবেছিলাম আয়েশাকে এক সেট নতুন কাপড় আর জুতো কিনে দেব। হল না। সেচের কেরোসিন কিনতেই চলে গেল। অন্তত নতুন একটা ব্যাগ... সেই কবেকার সাত পুরোনো ব্যাগটাই পিঠে নিয়ে কলেজে গেল মেয়েটা।

আয়েশার মা : কিন্তু তাতে আয়েশার কোনো দুঃখ নেই জানো।

আয়েশার বাবা : আমার আছে, আমার আছে। (দাঁড়িয়ে) অনেকেই বলাবলি করছে – শুনতে পাই – "খাওয়া পরারই ছিরি নেই, আবার মেয়েটাকে কলেজে ভর্তি করেছে, তাও আবার ইংরেজিতে অনার্স; টানতে পারবে?" – আয়েশার মা, বলো না, ও টানতে পারবে না?

আয়েশার মা : পারবে গো পারবে, ইনশাহআল্লাহ। দেখবে আমাদের আয়েশা একদিন আমাদের সবার মুখ উজ্জ্বল করবে।

আয়েশার বাবা : (আর্দ্র কণ্ঠে) তাই যেন হয় গো, তাই যেন হয়। সেটা যে খুব দরকার।

আয়েশার মা : আমরা হয়তো ওকে শহরে পাঠিয়ে কলেজে পড়াতে পারতাম না। ভাগ্যিস এই এলাকায় একটা কলেজ হল।

আয়েশার বাবা : হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। আচ্ছা আমি এবার যাই। দেখি কোথাও আর জায়গা পাই কি-না বাকি পাটগুলো জাক দেবার। (বোঝাটা তুলে নিয়ে) তুমি খেয়ে নিও; আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।

আয়েশার মা : সে তুমি এসো না।

(আয়েশার বাবা প্রস্থান করে। আয়েশার মা গেলাসটা তুলে নিয়ে ভিতরে যায়।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলেজ। টিফিন টাইম। আয়েশা সহপাঠিনীদের সাথে আড্ডায়। সবার মৃদু খিলখিল হাসি একত্রে)

পম্পা : কেন রে, একদিনের ক্লাস-নোট না পেলে তুই ফেল করবি নাকি?

আয়েশা : দে না, দে না, এই রকম করিস না।

বুলটি : না রে পম্পা, ওকে নোটগুলো দিবি না। এবার দেখি একদিনের ক্লাস-নোট না পাওয়ায় ও কেমন করে করে first না হয়। (হাসি)

আয়েশা : বুলটি, বদমাশি করিস না। গতকাল মায়ের শরীরটা খারাপ ছিল বলে আসতে পারিনি। Now please be kind to me!

বুলটি : ওরে ওরে আবার সেন্টু দিচ্ছে।

পম্পা : ওকে ওকে। দেব, কিন্তু একটা শর্তে।

আয়েশা : শর্ত? কি শর্ত?

পম্পা : আজ আমরা প্ল্যান করেছি সবাই মিলে মেলা দেখতে যাব। আর তোকেও যেতে হবে আমাদের সাথে।

বুলটি : ইয়েস। আব আয়েগি উট পাহাড় কে নিচে।

আয়েশা : মেলা? কখন?

পম্পা : এখনি।

বুলটি : জাস্ট নাউ।

আয়েশা : তোরা যা।

পম্পা : (ধমক দিয়ে) তুইও যাবি।

আয়েশা : (করুণ কণ্ঠে) না... ।

বুন্টি : ক্লাস-নোটস?

আয়েশা : মায়ের শরীরটা...

বুন্টি : চল না। তুই তো কোথাও যাস না। চল চল। বেশিক্ষণ থাকবো না, ওকে।

আয়েশা : আসলে তোরা তো জানিস যে...

পম্পা : (আয়েশার হাত ধরে) জানি। কিন্তু টাকার দরকার নেই তো। আমরা সেরকম কিছু কিনবো না।

বুন্টি : আর 'না' বলিস না।

গম্পা : তুই সাথে থাকলে ভালো লাগে।
আয়েশা : আ..., আচ্ছা, তাহলে চল। কিন্তু ক্লাস?
বুল্টি : (কোমরে হাত দিয়ে) আজ আর কোন ক্লাস আছে?
আয়েশা : (সলজ্জ মৃদু হেসে) না...। ওকে, তাহলে...
তিনজনে একত্রে: (হাত মিলিয়ে) লেটস্ গো। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(রাস্তা। আয়েশা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত পথিকের মতো বাড়ি ফিরছে। পিঠের ব্যাগটা যেন মনে হচ্ছে কয়েক মণ। অন্যমনস্ক। হঠাৎ একটা ক্ষিপ্রগতিতে ছোটো গাড়ির আওয়াজ।)

গাড়িচালক : (নেপথ্যে) দেখে হাঁটতে পারো না?

(আয়েশা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কোনোরকমে টাল সামলে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করে)

চতুর্থ দৃশ্য

(আয়েশাদের বাড়ি। আয়েশা খোলা বইয়ের সামনে বসে, অন্যমনস্ক। আয়েশার অসুস্থ মা আয়েশার কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আয়েশা অন্যমনস্ক।)

আয়েশার মা : আয়েশা। আয়েশা।
আয়েশা : উম..., হ্যাঁ
আয়েশার মা : ঘুমাবি না? বেশ রাত হল।
আয়েশা : ঘুমাব। আর একটু। তুমি শুয়ে পড়ো।
আয়েশার মা : আচ্ছা, তোর কি কিছু হয়েছে?
আয়েশা : কই কিছু না তো।
আয়েশার মা : আজ কলেজ থেকে এসে কাপড় পাল্টালি না।
আয়েশা : ও আজ ইচ্ছে করল না।
আয়েশার মা : ফেরার সময় মনটা ভারি বলে মনে হল।
আয়েশা : না না।
আয়েশার মা : তারপর থেকে চুপচাপ আছিস; বেশি কথা বলছিস না।
আয়েশা : বলছি তো।
আয়েশার মা : কি জানি মা। আমার বড়ো চিন্তা হয়।
আয়েশা : (মায়ের হাত ধরে) কোনো চিন্তা নেই মা। সব ঠিক আছে। (মৃদু কণ্ঠে) সব ঠিক আছে।
আয়েশার মা : তাই যেন হয় মা, তাই যেন হয়।

(আয়েশা একবার উপরের দিকে তাকায়; মনে মনে "আমিন" বলে; চওড়া হাসে ও মাথা নাড়ে। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে। মা তার মাথায় হাত বোলায়।)

আয়েশার বাবা : (নেপথ্যে) আয়েশার মা।

আয়েশার মা : আসছি গো। দেখি, তোর আব্বা এল আড়ৎ থেকে। (উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে) তুই এবার ঘুমিয়ে পড় মা।

আয়েশা : (একসঙ্গে ওঠে) আচ্ছা। (আয়েশার মায়ের প্রস্থান। আয়েশা পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে এবং পায়চারি শুরু করে।)

সব ঠিক হবে মা। সব যে ঠিক হতেই হবে। কিন্তু কি করে? কি করে? কি করে?

পঞ্চম দৃশ্য

(কলেজের ক্লাসরুম। পম্পা ও বুন্টি বেঞ্চে বসে। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য বেঞ্চে।)

পম্পা : কি ব্যাপার রে বুন্টি, আয়েশা তো আজও এল না এখানে?

বুন্টি : আমিও তো তাই ভাবছি।

পম্পা : আচ্ছা, তুই কি নোটিস করেছিস কিছুদিন থেকে ও কেমন absent minded থাকছে আর মাঝে-মাঝেই লেট করছে?

বুন্টি : (ভাবুক হয়ে) হুম, ওই মেলা দেখতে যাওয়ার পরের দিন থেকে।

পম্পা : এগজ্যাক্টলি। কি হলো বল তো?

বুন্টি : কেসটা কোয়াইটলি মিস্টিরিয়াস লাগছে; মামনি প্রেমে পড়ল না তো?

পম্পা : If the matter is so, আয়েশা প্রেমে "পড়বে" না, প্রেমে "উঠবে"! (দুজনেই হেসে ওঠে)

বুন্টি : তা যা বলেছিস; সবকিছুতে এত সিরিয়াস, বাব্বা!

পম্পা : ওই যে, উনি এসে গেছেন। ওয়েলকাম ম্যাডাম!

(আয়েশা হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে)

বুন্টি : কি কেস ম্যাডাম? You are late.

আয়েশা : সরি সরি! আজ লেট হয়ে গেল।

পম্পা : না, শুধু আজ নয়; বিগত কয়েকদিন ধরেই আপনি দেরি করে আসছেন। কি ব্যাপার বলুন তো।

আয়েশা : আরে কিছু না, ছাড়।

পম্পা : না না, কি কেস বল।

বুন্টি : বলে ফেল মামনি, বেশি কায়দা কোরো না।

আয়েশা : আচ্ছা পম্পা, তুই একদিন বলছিলিস না যে তোর কোনো একজন দাদা আছেন যিনি জুট মিলের ম্যানেজার?

পম্পা : উম... হ্যাঁ। তো?

আয়েশা : উনার সাথে একবার কথা বলা যাবে?

পম্পা : উম..., যেতে পারে। কিন্তু কি ব্যাপারে?

আয়েশা : আসলে আমি একটা বিষয়ে ভাবছি। আগে তোরা বল, আমার সাথে থাকবি।

(পম্পা ও বুন্টি একে অপরের দিকে তাকায়)

বুন্টি : বিষয়টা যদি ভালো হয় তাহলে...

আয়েশা : আশা করি ভালো!

পম্পা : তাহলে আছি সাথে। কিন্তু বিষয়টা তো বল।

আয়েশা : সেদিন আমরা মেলা দেখতে গেলাম। মেলাতে দেখেছিলিস দুটো স্টল ছিল, পাট দিয়ে তৈরি নানান জিনিসের?

বুল্টি : হ্যাঁ ছিল।

আয়েশা : একটা পাটের তৈরি ব্যাগ আমার খুব পছন্দ হয়েছিল জানিস। কিন্তু কি আগুন দাম... সাতশো টাকা!

বুল্টি : তা আমাকে বললি না, কিনে দিতাম। আরে তোকে গিফট করতাম।

আয়েশা : কতজনকে কিনে দিবি বুল্টি? কতজনকে? আমার মতো হাজার হাজার মেয়ের... হাজার হাজার মানুষের... পছন্দ হয় ওইরকম জিনিস। কিন্তু... তারা শুধু দেখে... চোখ ঝলসানো আলোয় সুসজ্জিত ওই জিনিসগুলো শুধু ফ্যালফ্যাল করে দেখে। দাম জিজ্ঞেস করে ঢোক গেলে; আর ওটাকে কিনে নিজের না করতে পারার কষ্ট ভোলে দারিদ্রের সান্ত্বনায়। পাশের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "দাদা, ওই মাটির পুতুলটা কত দাম? হ্যাঁ, ওই ছোট্টোটা।"

পম্পা : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হুম। কিন্তু কি আর করা যায়?

আয়েশা : করা যায় পম্পা, করা যায়। কিছু তো করা যায়। কিছু করার চেষ্টা তো করা যায়।

বুল্টি : যেমন?

আয়েশা : দ্যাখ, আমাদের বাবারাই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পাট চাষ করে; প্রচণ্ড রোদে মাঠে কাজ করে; পাট জাগ দেওয়ার জন্য বৃষ্টির আশায় ঈশ্বরকে ডাকে; রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে নোংরা জলে পাট পচায়; পচা পাটের গন্ধে পথচারীদের অনেকেই নাকে রুমাল দেন; অথচ আমাদের বাবারা ঘন্টার পর ঘন্টা সেই দুর্গন্ধ নোংরা জলে আবক্ষ ডুবে থেকে কাজ করে; তাদের হাত-পা ফ্যাকাশে হয়ে যায়! এমনকি মায়েদেরকেও সে-কাজে হাত লাগাতে হয়। তারপর, জলের দরে বিক্রি করতে হয় সেই পাট; তাও আবার আড়ৎদারের কত খুঁতখুঁতি। হা। এ যেন চাষির কন্যাদায়। অথচ সেই চাষিরই একমাত্র আদরের মেয়ের একটা পাট-ব্যাগ কেনার ইচ্ছেটা বিলাসিতা। ওই ব্যাগটা যে পাটে তৈরি, তাতে আমার আব্বার কপালের ঘাম আর আমার মায়ের হাতের স্পর্শ লেগে থাকতেও তো পারে! ...দ্যাখ, আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি।

পম্পা : কী প্রতিজ্ঞা?

আয়েশা : কিছু করব। এই পাট নিয়েই কিছু করব। আমাদের চাষ করা পাট বাইরে চালান হয়ে যায়। অথচ... আমরা তো কিছু করতেই পারি।

বুল্টি : কি করতে পারি?

আয়েশা : বিডিও অফিসে নানান হস্তশিল্পের ট্রেনিং দেওয়া হয় সরকারি উদ্যোগে। আমি বিগত কদিনে অনেকটা কাজ শিখে ফেলেছি।

বুল্টি : আই সি! এইজন্যেই তোর লেট হয়।

আয়েশা : এখন একটা কাজ... পাটের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো আর টেকসই করার কৌশল শেখা। পম্পা তোর ওই দাদার হেল্প দরকার।

পম্পা : সে আমি ম্যানেজ করে নেব।

আয়েশা : ওকে। তাহলে আমরা একটা ছোটো করে পাট-হস্তশিল্প শুরু করতে পারি।

বুল্টি : কিন্তু তাতে তো অনেক সব মেশিন লাগবে, আর প্রচুর টাকা...

আয়েশা : আমি খোঁজ নিয়েছি : প্রাথমিকভাবে আমরা জুট প্রসেসিং করব না; জুট ফেব্রিক কিনে কাজ শুরু করব। আর দু-একটা কাটিং ও সিউইং মেশিন কিনে কাজ শুরু করতে পারব। আর টাকা এবং কারিগর পেয়ে যাব মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলো থেকে।

পম্পা : কি করে?

আয়েশা : আমরা সব গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে কথা বলল। সবাই আশা করি 'না' বলবে না। গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টগুলো থেকে লোন ম্যানেজ করতে হবে। আর মাত্র ২৫ কিলোমিটারেই যেহেতু বড়ো একটা শহর, তাই আমাদের প্রোডাক্ট আশা করি বিক্রি হবে। সরকারি এগজিবিশনেও পার্টিসিপেট করতে পারি; তাতে অন্যরকম লাভ হবে।

পম্পা : আমরা অনলাইন শপিং-এর কথাও ভাবতে পারি। ই-কমার্স ব্রান্ডগুলোর ম্যানেজিং এগজিকিউটিভদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে পারি।ঃ

আয়েশা : ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া।

বুল্টি : ফেসবুক, ওয়াটসঅ্যাপেও প্রমোট করা যেতে পারে।

আয়েশা : চল্ না রে, স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করি।

তিনজনে একত্রে: (হাতে হাত দিয়ে) ওকে, লেটস্ গো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

যন্ত্রসঙ্গীতে 'আমরা করব জয়'। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পাট দিয়ে নানান জিনিস তৈরিতে ব্যস্ত। আয়েশা তাদেরকে কাজ দেখিয়ে দিচ্ছে। বুল্টি প্রোডাক্টগুলোর ছবি তুলছে মোবাইল ফোনে। পম্পা ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছে।

সপ্তম দৃশ্য

(ব্যানার : বাৎসরিক সংবর্ধনা সভা, ২০১৯, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

প্রথম সরকারি আধিকারিক : ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় হাজার প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে শ্রীমতি আয়েশা খাতুন। তার অদম্য প্রচেষ্ট ও উদ্যোগে যে পাট কুটিরশিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কাজের নমুনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব সন্তুষ্ট। আয়েশা তাদের শিল্প কেন্দ্রের যথার্থ নামকরণ করেছেন – "পাট-রানি"। এই শিল্প কেন্দ্রে প্রায় দেড়শোজন মহিলা বর্তমানে কর্মরতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়েশা খাতুনকে এ বছরের "সেরা বাঙালি নারী" হিসেবে মনোনীত ও সংবর্ধিত করে গর্বিত। আমরা শ্রীমতি আয়েশা খাতুন ও তার সঙ্গীদেরকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ জানাই। (আয়েশা, পম্পা, বুল্টি, আয়েশার বাবা ও মা এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা স্টেজে উঠে সকলকে নমস্কার করে।) আয়েশা এ-বছর ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক পাস করেছেন। তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে "সেরা বাঙালি নারী, ২০১৯"-এর মেমেন্টো এবং "পাট-রানি" শিল্পকেন্দ্রের

উন্নতিকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকার সরকারি অনুদান চেক তুলে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় সরকারি আধিকারিক পুরস্কার তুলে দেন। সকলে হাততালি দেয়।চেক তুলে দেওয়া হল।

প্রথম সরকারি আধিকারিক : আমরা "পাট-রানি"র যুগান্তকারী অগ্রগতি কামনা করি। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সকলে একত্রে : নমস্কার।

(যন্ত্রসঙ্গীতে "আমরা করব জয়"-এর সঙ্গীত।)

যবনিকা

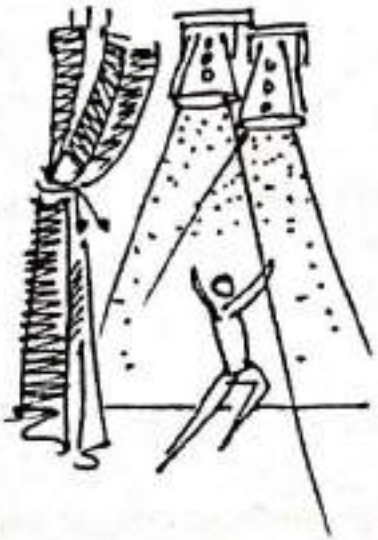

অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ;
আপনার ললাটের রতন প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোক লেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ
হে দন্ড বিধাতা রাজা-যে দীপ্ত রতন
পরায়ে দিয়েছো ভালে তাহারা যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক।

নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান- খান
রেখেছে ধুলিতে। প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্দ্ধ-পানে হায়।

যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খন্ড খন্ড করি তারে তরিবে সাগর?

নিবেদ্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর